ISSN-1813-0372

বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল-জুন : ২০১৫

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল - জুন : ২০১৫

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ সাধারণত সেই কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে চান। কারণ বিবেকবান লোকজন অর্থহীন কোন কাজে সময়, শ্রম ও মেধা ব্যয়কে অপচয় মনে করেন। আল-কুরআনুল কারীমের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা এই বিশ্বজগৎ ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন। বিশেষ করে এই ভূমণ্ডলে মানুষকে কেন প্রেরণ করা হয়েছে, এখানে মানুষের করণীয় এবং বর্জনীয় কী এসবই আল-কুরআনুল কারীমে বিবৃত হয়েছে।

মানুষ সব কাজের ক্ষেত্রেই একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে প্রজ্ঞাবান মানুষ মাত্রই কাজ শুরুর আগে সেটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করাকে জরুরী মনে করেন। আধুনিক যুগে এটি শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি অনুসৃত রীতি এবং শিক্ষাজগৎটাকেও এভাবেই সাজাতে চেষ্টা করা হয়, তাই বলা যায় মাকাসিদ তথা উদ্দেশ্য নির্ধারণ সকল কাজেরই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা বর্তমানে ইসলামী চিন্তাজগতের একটি অপরিহার্য অংশ। ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার-এর চলতি সংখ্যায় তাই "ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্" শীর্ষক প্রবন্ধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধের ভূমিকায় প্রবন্ধকার লিখেছেন, "মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ ইসলামী আইন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটি ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎসও। সময়ের আবর্তনে মানুষের জীবনে নানাবিধ নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হয়। এ নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য কী, আইনটি দিয়ে মানুষের কী কল্যাণ সাধিত হবে ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় আনা হয়। একইভাবে উক্ত আইনটির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্তে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে তার উদ্দেশ্যও বিবেচনা করা হয়। তাই বলা যায়, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী শরী'আহ্র বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করাই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র মূল আলোচ্য বিষয়।"

মূল পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্কে শাস্ত্র হিসেবে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পাঁচটি জিনিস হলো ১. মানুষের বিশ্বাস তথা ঈমানের সুরক্ষা, ২. জীবনের সুরক্ষা, ৩. বিবেক তথা বুদ্ধি ও চিন্তার সুরক্ষা, ৪. বংশধারার সুরক্ষা, ৫. সম্পদের সুরক্ষা। উল্লেখিত পাঁচটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সামগ্রিক উদ্দেশ্যের গুরুত্ব, অপরিহার্যতা ও প্রভাব বিবেচনা করে সবগুলোর তিনটি পর্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যায় তিনটি হলো, ১. জরুরিয়্যাত (অপরিহার্য), ২. হাজিয়্যাত (প্রয়োজনীয়), ৩. তাহসিনিয়্যাত (সৌন্দর্যবর্ধক)।

বস্তুত মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্-এর শ্লোগান হচ্ছে, মানুষের ক্ষতি হ্রাস করে কল্যাণ বৃদ্ধি করা। বিশ্ব মানবতার ক্ষতি হ্রাস করে কল্যাণ বৃদ্ধি করার কতগুলো মূলনীতি বিবৃত হয়েছে এই শাস্ত্রে। যেগুলো অনুসৃত হলে এবং এগুলোর আলোকে সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও বিচার, অর্থনীতি তথা সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালে সত্যিকার কল্যাণমূলক সমাজ গঠন করা সম্ভব। "ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গ এ থেকে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কিছু বিষয় থাকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলোর অবস্থায় তারতম্য ঘটে থাকে। কিছু বিষয় আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগেও সুনির্দিষ্টভাবে সেগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি, যাতে পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেকবান মানুষ সেগুলোর ব্যাপারে তাদের সুবিবেচনায় কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া স্বামীর স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকা না থাকা বিষয়ক সমস্যাটিও এমন একটি অনির্দিষ্ট বিষয়। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এ বিষয়টিতে মতপার্থক্য ছিল। সমস্যাটির পরিমাণ বর্তমানে যথেষ্ট বেড়েছে। তাই এ বিষয়ে একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে আসার লক্ষ্যে "নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ : একটি ফিক্হী পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টির ফিক্হী দিক তোলে ধরা হয়েছে। আইনপ্রণেতাগণ যদি ফিক্হের আলোকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সংস্কারের পদক্ষেপ নেন তাহলে এ ধরনের বিপদগ্রস্ত মহিলা ও সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীরা উপকৃত হবে।

মানবেতিহাসে রাসূলুল্লাহ স. শুধু শান্তির বার্তাবাহকই নন। তিনি দেখিয়ে গেছেন বিশৃঙ্খল একটি সমাজকে কিভাবে শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল সমাজে পরিণত করতে হয়। মানুষের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার রাসূলুল্লাহ স.-এর অনুসৃত রীতি ও কৌশল বিবৃত হয়েছে, "শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে। নিঃসন্দেহে এটি একটি সময়োচিত আলোচনা। যা থেকে পাঠকগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।

ইন্টারনেট আধুনিক সভ্যতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কিন্তু এর নেতিবাচক ব্যবহার মুসলিম অভিভাবক ও সমাজবিদদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ব্যক্তিগতভাবে এবং একান্ত অবস্থায় মানুষ যেসব কর্মকাণ্ড করে সেই অবস্থাতেও তাকে অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে একমাত্র তার উন্নত ও দৃঢ় নৈতিকতা তথা আল্লাহভীতি। যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারী নেই বা থাকে না সেখানে মানুষকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে আল্লাহভীতি ছাড়া আর কোন কার্যকর হাতিয়ার নেই, এটি পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। "ইসলামের আলোকে ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কুফল ও তা থেকে বাঁচার উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধটি থেকে এ সম্পর্কে যথার্থ দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

"পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধেও কিছু মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করলে পারিবারিক অপরাধের প্রতিকার সম্ভব।

মানুষের জন্যেই জীবজন্তু। অন্যান্য প্রাণীকুলের স্বাভাবিক বেঁচে থাকা এবং বহাল থাকার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। কিন্তু এদিকটি বর্তমান যুগের মানুষ ভুলতে বসেছে। ইসলাম বহু পূর্বেই এদের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছে। "ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে এ বিষয়গুলো তোলে ধরা হয়েছে। যা বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

বস্তুত বর্তমান সংখ্যায় যে ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে সবগুলোতেই রয়েছে উপকারী তথ্য-উপাত্ত। আশা করি এ সংখ্যাটিও সম্মানিত গবেষক ও পাঠক মহলে আদৃত হবে। পবিত্র রমাযানের এই মোবারক দিনে আমরা আমাদের সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত প্রার্থনা করছি; সেই সাথে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাঁর অফুরন্ত রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের বারিধারায় আমাদের স্নাত করুন। আমীন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ্ খন্দকার*

[**সারসংক্ষেপ:** *ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ নয়, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির কল্যাণ বিবেচনা করা হয়। আবার ইসলামী শরী'আহ্ শুধু পারলৌকিক কল্যাণের পথই দেখায় না, দেখায় কীভাবে ইহলোকেও শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অর্জন করা যায়। অন্য দিকে কল্যাণের বিপরীত অকল্যাণ। এই অকল্যাণ দূর করাও শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। কাজেই বলা যায়, সব ধরনের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ বা ক্ষতি দূর করা ইসলামী শরী'আহ্র অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহ্র এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে পরিভাষায় 'মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্' বলা হয়। ইসলামী শরী'আহ্র পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের একটি 'হিফয আল-মাল' বা সম্পদ সংরক্ষণ। ইসলামী অর্থনীতি এ 'হিফয আল-মাল'-এর অন্তর্ভুক্ত। পরিবর্তনশীল বিষয় হিসেবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ। এ প্রয়াসে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র সংজ্ঞা, ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতিতে শরী'আহ্র সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বণ্টনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা ও এর আলোকে নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।]*

১. ভূমিকা

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ ইসলামী আইন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটি ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎসও। সময়ের আবর্তনে মানুষের জীবনে নানাবিধ নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হয়। এ নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য কী, আইনটি দিয়ে মানুষের কী কল্যাণ সাধিত হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়।

---

* সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.।

একইভাবে উক্ত আইনটির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্তে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে তার উদ্দেশ্যও বিবেচনা করা হয়। তাই বলা যায়, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী শরী'আহ্র বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করাই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র মূল আলোচ্য বিষয়।

হিফয আল-নফস বা জীবন সংরক্ষণ, হিফয আল-দ্বীন বা ধর্ম সংরক্ষণ, হিফয আল-আকল বা বিবেক সংরক্ষণ, হিফয আল-নসল বা বংশধারা সংরক্ষণ ও হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ এই পাঁচটি বিষয়কে ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মানুষের জীবনকে সুখময় ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সকল সম্পদ। এসব সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ আর মানুষকে দেওয়া হয়েছে ভোগ-ব্যবহারের অধিকার। দুনিয়ায় মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সম্পদ একটি জরুরি উপাদান। এ জন্য ইসলামী শরী'আহ্ এ সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশকে তার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর উৎপাদন, বণ্টন, হস্তান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেয় সুস্পষ্ট নির্দেশনা। শরী'আহ্র এসব নির্দেশনা ও বিধিবিধান অনুসরণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিনির্মাণ করা যায়। একইভাবে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্কে বিবেচনায় রেখে সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়।

২. মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র সংজ্ঞা

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ আরবী দুটি শব্দ 'মাকাসিদ' (مقاصد) ও 'শরী'আহ্'(شريعة)-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'মাকাসিদ' শব্দটি 'মাকসাদ' বা 'মাকসিদ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গন্তব্য, তাৎপর্য, মর্ম, বক্তব্য ইত্যাদি। এসবের মধ্যে প্রধানতম অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। আর শরী'আহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ দীন, পথ, জীবনব্যবস্থা, নিয়মনীতি ইত্যাদি। সুতরাং মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্'র অর্থ করা যায়– শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আরবীতে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য 'হাদাফ' (هدف) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ উদ্দেশ্য বা সুউচ্চ ভিত্তিভূমি বা বালিয়াড়ির শীর্ষদেশ বা পর্বতের চূড়া।

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র ক'টি প্রামাণ্য সংজ্ঞা হলো :

২.১. ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী রহ. বলেন,

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

শরী'আহ্র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের আকীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করা। যা কিছু এই পাঁচটি জিনিসের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে তা-ই জনকল্যাণকর ও কাম্য। অপরদিকে যা এগুলোর ক্ষতি করে তা অকল্যাণকর এবং এর দূরীকরণই কাম্য।[১]

২.২. ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী রহ. বলেন,

المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا.

শরী'আহ্র প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে তার খেয়ালখুশির বন্ধন থেকে মুক্ত করা, যাতে সে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বান্দাহ্য় পরিণত হতে পারে, যেভাবে সে বাধ্যগতভাবে তাঁর বান্দাহ্ হয়ে আছে।[২]

২.৩. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনে আশূর বলেন,

المقصد العام من التشريع وهوحفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه

ইসলামী শরী'আহ্র সার্বিক উদ্দেশ্য হলো মানবসমাজের শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করা এবং মানবজাতির কল্যাণ ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাদের সার্বজনীন ও সার্বক্ষণিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মানুষের কল্যাণ গঠিত হয় তাদের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা, কর্মের যথার্থতা এবং যেখানে সে বসবাস করে সেখানকার পার্থিব বস্তুনিচয়ের উত্তমতার দ্বারা।[৩]

২.৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন,

إن مقاصد الشريعة انما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمفاسد عنهم

মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করা।[৪]

---

১. আবু হামিদ আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা মিন ইলম আল-উসূল*, কায়রো : আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ১৯৭৩, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০

২. ইব্রাহীম ইবনু মূসা আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, রিয়াদঃ দারু ইবনি 'আফফান, ১৯৯৭, খ. ২, পৃ. ২৮৯

৩. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনু আশূর, *ট্রিটিজ অন মাকাসিদ আল-শরী'আহ্*, ওয়াশিংটন : দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৬, পৃ. ৯১

৪. ইউসুফ আল কারযাভী, *ফিকহুয-যাকাত*, বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩১

২.৫. প্রফেসর ড. আহমাদ আর-রাইসুনী বলেন,

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

সকল মানুষের কল্যাণার্থে যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শরী'আহ্ প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোই হলো মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্।[৫]
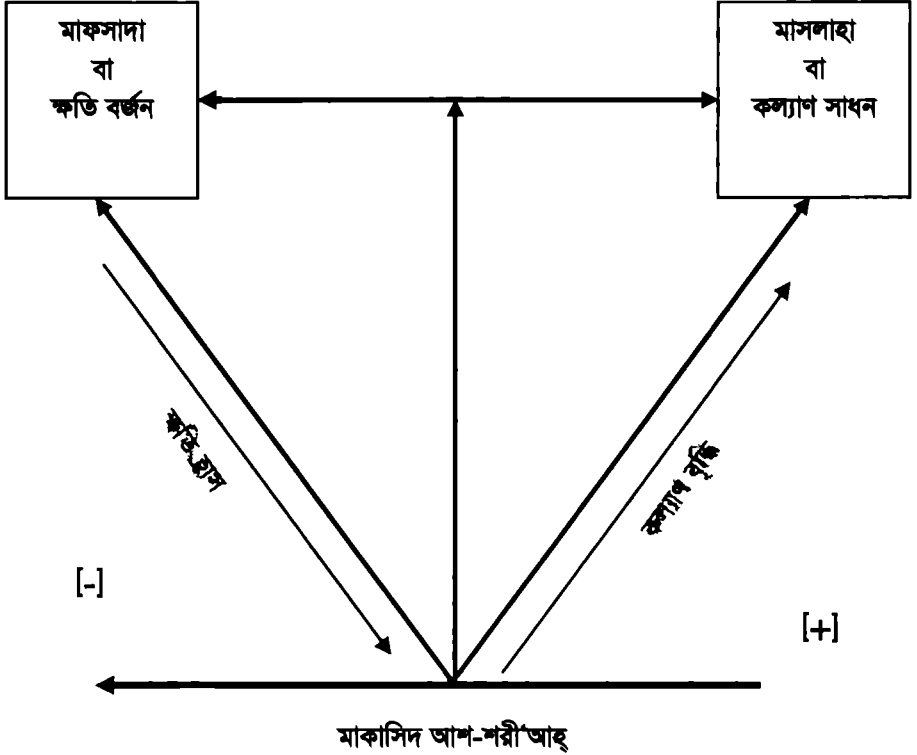
চিত্র-১

৩. ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি

ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকীহগণ কুরআন-সুন্নাহ্ গবেষণাপূর্বক শরী'আহ্র বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। ইমাম গাযালী রহ. ও তাঁর শিক্ষক ইমামুল হারামাইন আবু আল-মা'আলী আল-জুয়াইনী রহ. দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও

---

৫. ড. আহমদ আর-রাইসুনী, *নাযরিয়াতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ-শাতিবী*, রিয়াদ : দারুল আল্লামিয়্যাহ্, ১৯৯০, পৃ. ১৯

সম্পদ সংরক্ষণকে ইসলামী শরী'আহ্‌র ওয়াজিব পর্যায়ের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম শাতিবী রহ. তাঁদের এই তালিকাকে সমর্থন করেছেন এবং এগুলোকে শরী'আহ্‌র মূলনীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এম. উমর চাপড়া বলেন, ইমাম গাযালী ও শাতিবী রহ. সমর্থিত উক্ত পাঁচটি বিষয়ই শুধু শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইসলামী শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণের চিন্তাধারা আরো অনেক উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাক্ষ্য দেয়। তবে উক্ত পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণকে মূল বা প্রাথমিক এবং অন্যগুলোকে আনুষঙ্গিক বা অনুগামী (corollary) উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। আবার কখনো কখনো এসব আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যের গুরুত্বও অপরিসীম। সময়ের ব্যবধানে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেন, সময় পরিবর্তিত হয়েছে এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনে পরিবর্তন এসেছে। ফলে আমাদেরকে বর্তমানের আলোকে শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।[৬]

প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তখনকার সময়েও শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য শুধু উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সে সময় আরো বহু বিষয়কেই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, শিহাব উদ্দিন আল-কারাফী মানুষের সম্মান রক্ষা করাকে (protection of honour) ইমাম গাযালী রহ.-এর বিদ্যমান উক্ত তালিকায় যোগ করেন। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (establishing justice), সমাজকল্যাণ সংরক্ষণ (protection of social welfare) এবং অন্যায় ও অসামাজিক কার্যকলাপের নিষিদ্ধকরণকে (prohibition of injustice and unsocial activities) মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করেন।

সম্ভবত ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্‌র বিদ্যমান তালিকার সাথে বহু নতুন বিষয় যোগ করেন। তিনি চুক্তি সম্পাদন, আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয় যেগুলো দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সততা, আত্মিক পরিশুদ্ধি ইত্যাদি যেগুলো আখিরাতের সাথে জড়িত এর সবই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৭]

---

৬. এম. উমর চাপড়া, *দি ইসলামিক ভিশন অব ডেভেলপমেন্ট অন দি লাইট অফ মাকাসিদ আল-শরী'আহ্*, লন্ডন : ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি), ২০০৮, পৃ. ৭

৭. মুহাম্মদ হাশিম কামালী, *মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ মেড সিম্পল*, লন্ডন : ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি), ২০০৯, পৃ. ৮

রশীদ রিযা যেসব বিষয়কে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেন সেগুলো হলো : বিশ্বাসের স্তম্ভসমূহের পুনর্গঠন (reform of the pillars of faith), এই সচেতনার বিস্তার যে, ইসলাম হলো বিশুদ্ধ স্বভাবগত প্রবণতা, যুক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পরীক্ষা ও স্বাধীনতার ধর্ম এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[৮]

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত আত-তাহির ইবনে আশূর কুরআন-সুন্নাহ্ গবেষণা করে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ শনাক্ত করেছেন। তিনি শৃঙ্খলা (orderliness), সাম্য (equality), স্বাধীনতা (freedom) ও ফিতরাত বা খাঁটি স্বভাবধর্মের সংরক্ষণকে (preservation pure natural disposition) মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৯]

ড. ইউসুফ আল কারযাভী মানুষের বিশ্বাসের সংরক্ষণ, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা (maintaining human dignity and rights), ইবাদতের প্রতি আহ্বান (calling people to worship), নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ (restoring moral values), ভালো পরিবার গঠন (building good families), নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার (treating women fairly), শক্তিশালী ইসলামী জাতি গঠন (building a strong Islamic nation), সহযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব গঠন (cooperative world) ইত্যাদিকে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০]

ইমাম গাযালী রহ. ও তাঁর শিক্ষক আল-জুওয়াইনী রহ. কর্তৃক চিহ্নিত দীন, প্রাণ, জ্ঞান, বংশ ও সম্পদ সংরক্ষণ করাকে অধিকাংশ ফকীহ্ শরী'আহ্র মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও তাঁরা কেউ-ই গাযালীর পরম্পরা (sequence) অনুসরণ প্রয়োজনীয় মনে করেননি। এমনকি শাতিবী রহ.-ও সবসময় তা অনুসরণ করেননি। অবশ্য পরম্পরা সাজানোর বিষয়টি নির্ভর করে আলোচনার ধরন ও প্রকৃতির ওপর। ইমাম গাযালী রহ.-এর এক শতাব্দী পর প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. জীবন (নফস) সংরক্ষণকে শরী'আহ্র উদ্দেশ্যাবলির প্রথমে স্থান দেন।[১১] তাঁর বিন্যাসটি ছিল প্রাণ, সম্পদ, বংশ, দীন ও জ্ঞান।[১২]

জীবন (النفس) বা প্রাণসত্তাকে ইসলামী শরী'আহ্র প্রথম উদ্দেশ্য হিসেবে দেখালে যে চিত্র দাঁড়ায় তা হলো,

---

৮. জাসের আওদা, *মাকাসিদ আল-শরী'আহ্ এ্যজ ফিলোসোফি অব ইসলামিক ল'*, লন্ডন : দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৮, পৃ. ৬

৯. জাসের আওদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১০. জাসের আওদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১১. এম. উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১২. ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল *'আতি মুহাম্মদ 'আলী, আল মাকাসিদুশ্ শারী'আহ্ ওয়া আছারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৭, পৃ. ১৬৪
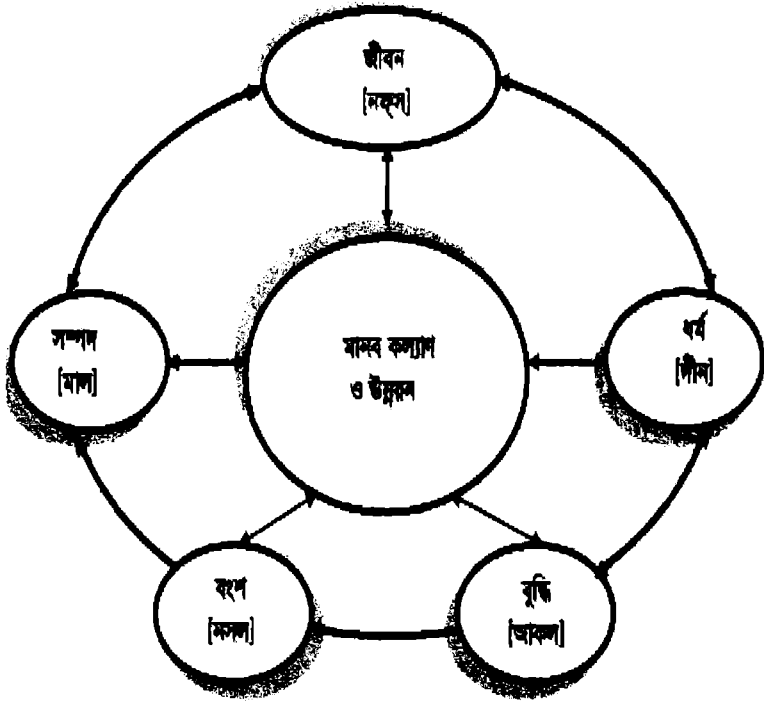
চিত্র-২

৪. ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

ইসলামী অর্থনীতি হলো ইসলামী শরী'আহ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতি বলতে এমন একটি অর্থব্যবস্থাকে বুঝাবে যার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং কর্ম-পদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্র নীতিমালা ও আদর্শ প্রতিফলিত হবে। ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য যেমন মানবতার কল্যাণ সাধন করা তেমনি ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যও হলো মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা। যেমন, মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী (১২০১-১২৭৪ খৃ.) ও ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খৃ.) ইসলামী অর্থনীতিকে জনসাধারণের কল্যাণের সাথে জড়িত বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছেন। এগুলোর মধ্যে ক'টি হলো :

ড. এস. এম. হাসানউজ্জামান বলেন,

> Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shariah that prevent injustice in

the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enables them to perform their obligation to Allah and the society.[১৩]

ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বন্টন প্রক্রিয়ায় অবিচার, জুলম ইত্যাদি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শরী'আহ্র বিধি-নিষেধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, যাতে করে মানুষ আল্লাহ্ ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়।

ড. এম. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী বলেন,

Islamic economics is the Muslims thinkers response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience.[১৪]

সমকালীন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম চিন্তাবিদগণের জবাবই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। এই প্রচেষ্টায় তারা কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন।

ড. এম উমর চাপরা বলেন,

Islamic economics is that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resource that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.[১৫]

ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বন্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সামষ্টিক অর্থনীতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।

---

১৩. এস. এম. হাসানুজ্জামান, ডিফিনেশন অব ইসলামিক ইকোনোমিক্স, *জার্নাল অব রিসার্স ইন ইসলামিক ইকোনোমিক্স*, জেদ্দা, ১৯৮৪, পৃ. ৫২

১৪. এম. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, *হিস্টরি অব ইসলামিক ইকোনোমিক থ্যট*, লেকচার অন ইসলামিক ইকোনোমিক্স, ইসলামিক রিসার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা, ১৯৯২, পৃ. ৩৩

১৫. এম. উমর চাপরা, *হোয়াট ইজ ইসলামিক ইকোনোমিক্স?* ইসলামিক রিসার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩

৫. ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্

ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ মূলত হিফয আল-মাল-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বুঝায় চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষা করা, ন্যায়নীতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেন পরিচালনা করা এবং এমন হাতে তা আমানত রাখা, যে হাত তা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে। আবার আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ অর্জনের যেসব পন্থা-পদ্ধতি হালাল করেছেন, তার বাইরে গিয়ে মানুষের সম্পদ গ্রাস না করাও হিফয আল-মালের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম গাযালী ও শাতিবী রহ. উভয়ই হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণকে পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের সর্বশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব কম। প্রকৃতপক্ষে সম্পদের গুরুত্ব এতই অধিক যে, এটি ছাড়া অন্য চারটি উদ্দেশ্যের মাধ্যমে মানুষের পূর্ণ কল্যাণ সাধন করা যায় না। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী 'হিফয আল-মাল'কে হিফয আন-নফস-এর পরেই উল্লেখ করেছেন।[১৬] মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্‌র আলোকে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য।

৬. ইসলামী অর্থনীতিতে শরী'আহ্‌র সাধারণ উদ্দেশ্য

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। সম্পদ সংরক্ষণ, এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে সার্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, আল-মাসলাহা আল-আম্মাহ্ বা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং জনস্বার্থ ও সুবিচার বিরোধী কাজ প্রতিহত করার লক্ষ্যে ইসলামী অর্থনীতির সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- সম্পদ সংরক্ষণ
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা
- অর্থনৈতিক দাসত্ব মোচন
- মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন
- মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনমান উন্নত করা
- সর্বাধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পূর্ণকর্মসংস্থান
- অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করা
- সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ
- দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার সংরক্ষণ

---

১৬. এম. উমর চাপড়া, *দি ইসলামিক ভিশন অব ডেভেলপমেন্ট অন দি লাইট অফ মাকাসিদ আল-শরী'আহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

- নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন
- আয় ও সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন
- কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন

৬.১. সম্পদ সংরক্ষণ

হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ ইসলামী শারী'আহ্র মৌলিক ও চিরন্তন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। হিফয আল-মাল পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এটি মূলত সম্পদ অর্জন, উন্নয়ন ও বণ্টন, মূলধন গঠন, সম্পদের সঞ্চালনসহ পুরো সম্পদ ব্যবস্থাপনাকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহ্তে বহু দিক-নির্দেশনা রয়েছে এবং ইসলামী শরী'আহ্ এ ব্যাপারে বহু আইন-কানুন প্রণয়ন করেছে। এখানে তা থেকে ক'টি তুলে ধরা হলো :

৬.১.১. মালিকানা রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো তা কারো জিম্মায় বা মালিকানায় দিয়ে দেয়া। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ইসলামী শরী'আহ্তে সম্পদের মূল মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্; কিন্তু উক্ত সম্পদ ব্যয়-ব্যবহারের মালিকানা মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾

'আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে। অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়।'[১৭]

আর মালিকের দায়িত্ব হলো তার মালিকানাধীন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৬.১.২. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো মানুষের হাতে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ-সম্পদ একত্র করে মূলধন গঠন করা। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। আর পুঁজি যোগাড় করার মোক্ষম পদ্ধতি হলো সঞ্চয় করা। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত পুঁজি বা গচ্ছিত অর্থ দিয়ে বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা।

---

[১৭] আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১

মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশনাগুলো হলো :

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾

আর তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না আবার তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।[১৮]

খ. রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া অধিক উত্তম, তাদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়া থেকে।[১৯]

গ. রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك

কিছু সম্পদ নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম।[২০]

৬. ১. ৩. পবিত্রকরণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

ব্যক্তি ও সমষ্টির ধন-সম্পদের ধ্বংস ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের একটি পদ্ধতি হলো তা থেকে আল্লাহ্ ও গরিবের হক বের করার মাধ্যমে তা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। তাই ইসলামে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে তার জন্য তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যেন গরিব, নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।[২১]

যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, কাফ্ফারা ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও রক্ষা করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

---

১৮. আল-কুরআন, ১৭ : ২৯

১৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মানাকিবুল আনসার, অনুচ্ছেদ : কাওলুন নাবী স. আল্লাহুম্মা আমদি লি আসহাবি হিজরাতাহুম ওয়া মারসিয়াতাহু লিমান মাতা বি মাক্কা, মিশর : মুয়াস্সাসাতু জাদ, ২০১২, খ. ২, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং-৩৯৬৩

২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-ওসায়া, অনুচ্ছেদ : ইযা তাসাদ্দাকা আও আওকাফা বাযা মালিহি আও বাযা রাকিকিহি আও দাওয়াব্বিহি ফা হুয়া যায়িজুন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫, হাদীস নং- ২৭৫৭

২১. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।[২২]

ধনীর মালে গরিবদের অধিকারের সম্পর্ক খুবই দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্ন। যাকাত মূল মালের মধ্যে শামিল। মূল মালটাই ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকবে, যতক্ষণ না তা থেকে যাকাত বের করা হবে। নবী করীম স. বলেন,

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে তখন তা থেকে তুমি খারাবিটা দূর করে দিলে।[২৩]

তিনি আরো বলেন,

... فَلاَ تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكَ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.

যদি তুমি (যাকাত) বের করে না দাও তাহলে হারামটা হালালটাকে ধ্বংস করবে।[২৪]

৬.১.৪. সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি পদ্ধতি হলো একে আটক না রেখে এর স্বাভাবিক সঞ্চালন নিশ্চিত করা। সমাজের কতিপয় ব্যক্তির হাতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত হওয়া ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকার পরিবর্তে সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সকলের হাতে সম্পদের আবর্তনই শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ ﴾

মহান আল্লাহ্ যা কিছু জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য, রাসূলের জন্য, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও পথচারীদের জন্যে, (সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করো) যেন তা কেবল তোমাদের বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয়।[২৫]

---

২২. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩

২৩. আবু আবদিল্লাহ আল হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, অধ্যায় : আযযাকাত, বৈরুত : দারু কুতুবিল ইসলামীয়্যাহ, ১৯৯০, খ. ১, পৃ. ৫৪৮, হাদীস নং- ১৪৩৯

২৪. আবু বাকর 'আবদুল্লাহ আল-হুমাইদী, *আল-মুসনাদ,* আহাদীসু 'আয়িশা, তাহকীক: হাবীবুর রাহমান আল-আ'যামী, বৈরুত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১১৫, হাদীস নং- ২৩৭

২৫. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৬.১.৫. সম্পদ অর্জন ও এর উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আগে আসে তা অর্জন ও তার উন্নয়ন সাধনের কথা। মানুষের বৈধ চাহিদা পূরণ ও তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের বিকল্প নেই। এ জন্য ইসলামী শরী'আহ্তে সম্পদ অর্জন, এর উন্নয়ন সাধন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সম্পদকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুযোগ ও সামর্থ্য থাকার পরও সম্পদ অর্জন না করার অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এ জন্য ফরয ইবাদতসমূহ সম্পাদনের পরই প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব হালাল রিযিক অর্জন করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾

অতঃপর যখন সালাত আদায় শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র তা'আলার অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করো।[২৬]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

অন্যান্য ফরয আদায়ের পর হালাল রুজি অন্বেষণ করাও একটি ফরয।[২৭]

ইসলামী শরী'আহ্ সম্পদকে যেমন আল্লাহ্র অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করে, তেমনি তা অর্জন না করে আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতার নামে শুধু ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়াকেও নিরুৎসাহিত করে। একইভাবে উপার্জনের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ নিজের দখলে থাকার পরও তা ব্যবহার করে উপার্জনে আত্মনিয়োগ না করাকেও ইসলামী শরী'আহ্ সমর্থন করে না। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

দান-খয়রাত গ্রহণ করা কোনো ধনী লোকদের জন্য বৈধ নয়, শক্তিমান ও সুস্থ ব্যক্তির জন্যও নয়।[২৮]

---

২৬. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

২৭. আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : ফাযায়িলু কাসবিল হালাল, বৈরুত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯, খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস নং- ৯২৩১

২৮. ইমাম তিরমিযী, *আল জামি*, কুতুবুস সিত্তা, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মা যায়া মান লা তাহিল্লু লাহু সাদাকাহ্, খ. ১, পৃ. ১৮৩৬, হাদীস নং- ৬৫২
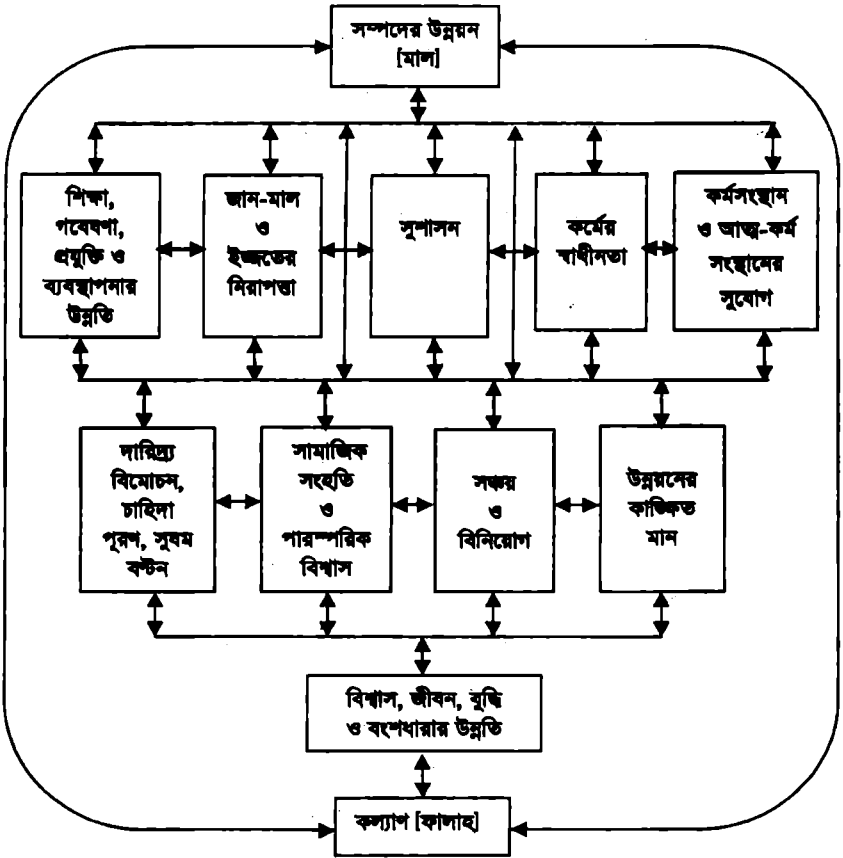
চিত্র-৩

৬.১.৬. ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাই তা ধ্বংস করার অধিকারও তার নেই। ইসলামী শরী'আহ্ মানুষকে সম্পদ অর্জন ও তা ভোগ করার অধিকার প্রদান করেছে এবং পাশাপাশি সকল ধরনের ক্ষতি, ঝুঁকি ও ধ্বংসের হাত থেকে সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাকে প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব অবহেলার কারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ ধ্বংস না করার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَ﴾

'আল্লাহ্ তা'আলা যে ধন-সম্পদ তোমাদের প্রতিষ্ঠালাভের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন, তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না। (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।'[২৯]

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেরদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।[৩০]

সম্পদ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইসলামী শরী'আহ্ এতোটাই গুরুত্ব প্রদান করে যে, তা যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যেও ধ্বংস করা যায় না। প্রথম খলীফা আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে কোনো এক যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন তিনি বাছ-বিচার না করে হত্যা করতে এবং এমনকি শত্রু দেশের শস্যক্ষেত বা জীবজন্তু ধ্বংস করতে নিষেধ করেছিলেন।[৩১]

৬.১.৭. অন্যায় ও আত্মসাৎ থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি উপায় হলো তাকে অন্যায় ও আত্মসাৎ থেকে রক্ষা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হচ্ছে তা-ই, যা কোনো ব্যক্তি নিজের শ্রমশক্তি ব্যবহার করে অর্জন করে। অন্য দিকে ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করে সম্পদ অর্জন করা যাবে না, যাতে অন্যের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ ন্যায়নীতি বহির্ভূত পন্থা যেমন সুদ, প্রতারণা, জুয়া, ধোঁকাবাজি ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে সম্পদ আহরণ করা বৈধ নয়।

ইসলামে হারাম বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ব্যয় উভয়ই নিষিদ্ধ। আবার বৈধভাবে অর্জিত কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়াও অবৈধ। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ لاَتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না।[৩২]

৬.১.৮. ভোগবিলাস ও অপচয় থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

মাত্রাতিরিক্ত ভোগবিলাস ও লাগামহীন অপচয় এক দিকে যেমন সম্পদ নষ্ট করে, অন্য দিকে তা আবার অর্থনৈতিক মন্দা ডেকে আনে। তাই ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা দূর হলে মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য লেগে থাকবে না এবং অপচয়ের মাধ্যমে তা

---

২৯. আল-কুরআন, ৪ : ৫

৩০. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

৩১. ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০, পৃ. ১৯৮

৩২. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

নষ্টও করবে না। এ জন্য ইসলাম মানুষকে ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের পরিবর্তে সহজসরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। ইসলাম ঘোষণা করে,

﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا-إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না, 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।[৩৩]

৬.১.৯. সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি ও দুর্নীতি থেকে সম্পদ সংরক্ষণ

জীবন ধারণের জন্য সম্পদ প্রয়োজন; কিন্তু অনেক সময় ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ মানুষকে স্বার্থবাদী করে তোলে। ফলে তারা দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, জবরদখল ইত্যাদি অবৈধ পন্থায় অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেবুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।[৩৪]

৬.১.১০. সম্পদের মূল্যমান রক্ষার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি পদ্ধতি হলো এর মূল্যমান রক্ষা করা। পণ্যদ্রব্য ও অর্থের মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি আবশ্যিক শর্ত। মূলত এর ওপরই আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে। পণ্যদ্রব্য ও অর্থমূল্যের স্থিতিশীলতার ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾

পরিমাপ ও ওযন পূর্ণ করো ন্যায্যভাবে।[৩৫]

﴿ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

আর তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিয়ো না।[৩৬]

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾

মাপ পূর্ণ করো এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৩৭]

---

৩৩. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭
৩৪. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮
৩৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৫২
৩৬. আল-কুরআন, ৭ : ৮৫
৩৭. আল-কুরআন, ২৬ : ১৮১

রাসূলুল্লাহ্ স. এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খায়বারের সকল খেজুরই কি এরূপ উত্তম?' লোকটি বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহর শপথ! সকল খেজুর এরূপ নয়। আমরা এগুলোর এক ছা' অন্যগুলোর দু' ছা'র বিনিময়ে এবং এগুলোর দু' ছা' অন্যগুলোর তিন ছা'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি।' রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'এরূপ করবে না। বরং পাঁচমিশালি খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে উত্তম খেজুর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে।'[৩৮] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ স. খেজুরের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটা করা না হলে উক্ত পণ্যের অবমূল্যায়নের আশঙ্কা থেকে যেত।

৬.২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘাত-সংঘর্ষ ও লাগামহীন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। 'জোর যার মুল্লুক তার' ও 'শুধু যোগ্যতমেরাই টিকে থাকবে' এমন নীতির পরিবর্তে সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ, মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ সাধন ও মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য পারস্পরিক কুরবানি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করাই ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ভ্রাতৃত্বের দাবি হচ্ছে– কোনো মানুষই তার ভাইকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারে না, ভাইকে বিপদে ফেলে, তাকে বঞ্চিত করে সকল কল্যাণ নিজেই ভোগ করতে পারে না। একজন মানুষ কখনই নিজেকে অন্য ভাইয়ের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মনে করতে পারে না। ভ্রাতৃত্বের দাবি অনুযায়ী একচেটিয়া কারবার, ফটকাবাজি, মজুতদারি, দুর্নীতি, ধোঁকাবাজি, সুদ ও জুয়া কোনোক্রমেই সমর্থিত হতে পারে না। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'প্রতিযোগিতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহিত করা যায় যতক্ষণ তা সুস্থ থাকে, দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ইসলামের সার্বিক উদ্দেশ্য মানবকল্যাণে সহায়তা করে। যখনই তা সীমালঙ্ঘন করে, প্রতিহিংসা ও দাম্ভিকতার জন্ম দেয় এবং নৃশংসতা ও পারস্পরিক ধ্বংসের কারণ হয়, তখনই তা সংশোধন করতে হবে।'[৩৯]

---

৩৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : ইযা আরাদা বাইয়া তামরিন বিতামরিন খাইরিম মিনহু, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫০, হাদীস নং-২২০১-২২০২

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال (أكل تمر خيبر هكذا) . فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) .

৩৯. ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

এক ভাই পেট ভরে খাবে আর এক ভাই না খেয়ে থাকবে ইসলামে তা সমর্থন করা হয় না। বরং বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে পরস্পরকে সহায়তা করবে, এটাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। পারস্পরিক সহায়তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

ভালো কাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে না।[৪০]

৬.৩. অর্থনৈতিক দাসত্ব মোচন

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দাসত্ব দূর করা ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই এক-একজন খলীফা বা প্রতিনিধি। এখানে কেউ কারো দাস নয়। তাই সমাজের সকল শ্রেণিকে সম্বোধন করে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, ﴿ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ 'তোমরা সকলেই একই দলের অন্তর্ভুক্ত, সবাই সমান।'[৪১]

যেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নবী-রাসূলগণ, বিশেষ করে শেষনবী মুহাম্মদ স. পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তার একটি হলো মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। যেমন আল কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে,

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

এবং যিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে এবং শৃঙ্খল হতে- যা তাদের ওপর ছিল।[৪২]

এ আয়াতে ব্যবহৃত 'আগলাল' (أغلال) বা শৃঙ্খল শব্দের একটি অর্থ করা হয়েছে, পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল।[৪৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই দাসে পরিণত করা যায় না। কোনো ব্যক্তি, এমনকি রাষ্ট্রও মানুষের এ স্বাধীনতা হরণ করে তাকে দাসে পরিণত করার অধিকার রাখে না। মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো ব্যক্তির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেউ কারো প্রভু নয় আবার কেউ কারো দাস নয়- এটাই ইসলামের শিক্ষা। এক্ষেত্রে জীবনোপকরণের দিক থেকে শ্রেণিগত স্বভাবজাত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অধিকারের দিক থেকে সবাই সমান।

---

৪০. আল-কুরআন, ৫ : ২
৪১. আল-কুরআন, ৪ : ২৫
৪২. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭
৪৩. আল কুরআনুল করীম, (অনুবাদ) : ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, পৃ. ২৫৪

৬.৪. মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন

ইসলামী শরী'আহ্ ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ অর্জনকে নিজের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামী শরী'আহ্ দুনিয়াকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে চায়, যাতে দুনিয়া যথার্থই আখিরাতের শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় এবং মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়। এই কল্যাণ লাভের জন্য মানুষকে প্রচেষ্টা সাধনের আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

> আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।[৪৪]

মুসলিম আইনবেত্তাগণের দৃষ্টিতে ইসলামী শরী'আহ্র প্রতিটি বিধানই প্রণীত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তাকে সভ্য করে গড়ে তোলার জন্য, যাতে সে নিজের এবং সমাজের জন্য কল্যাণের উৎস হতে পারে এবং সে যেন কোনোভাবেই অকল্যাণের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন,

> فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها

> শরী'আহ্র ভিত্তি হচ্ছে মানুষের প্রজ্ঞা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সার্বিক আদল, দয়া-মমতা, কল্যাণকামিতা ও প্রজ্ঞার মধ্যে।[৪৫]

কাজেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শরী'আহ্র বিধান প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা, দুঃখ-কষ্ট দূর করা ও জীবনমান উন্নত করাসহ ব্যক্তি ও সমষ্টির সকল প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা।

৬.৫. মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনমান উন্নত করা

সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক অর্থনীতির একটি উদ্দেশ্য। ইসলাম প্রত্যেকের সম্মানজনক জীবিকা নিশ্চিত করা ও দুঃখ-কষ্ট লাঘবের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে চায়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং আরো যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আধুনিক যুগে মূর্খতা দূর করার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মূর্খ ব্যক্তি তাৎপর্যগতভাবে মৃত। একইভাবে চিকিৎসা ও বিবাহের ব্যবস্থা করাও ইসলামী শরী'আহ্র মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

---

৪৪. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

৪৫. ইমাম ইবনুল কায়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ৩, পৃ. ৫

রাষ্ট্রের দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেছেন,

> নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের একটি প্রধান দায়িত্ব। বায়তুল মাল হতেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া বেকারত্ব দূর হবে না। এ জন্য সরকারকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।[৪৬]

৬.৬. সর্বাধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পূর্ণকর্মসংস্থান

মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর সব সম্পদ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে সে সম্পদের যথাযথভাবে ব্যবহার করবে। সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং নিশ্চিত হবে সর্বাধিক উৎপাদন ও উন্নয়ন।

সবকিছু দেওয়ার মালিক আল্লাহ্ তা'আলা; কিন্তু চেষ্টার দায়িত্ব মানুষের। নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিজেদেরই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

> আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[৪৭]

উক্ত নির্দেশনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো, নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনে নিজেদেরকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ যথাসাধ্য কাজে লাগাতে হবে। কোনো সম্পদ অযথা ফেলে রাখা কোনোভাবেই কাম্য নয়, বরং শরী'আহ্র দাবি হলো সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করা।
ইসলাম সম্পদের ওপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করেছে; কিন্তু সে সম্পদ উৎপাদনে কাজে না লাগিয়ে ফেলে রাখার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾

> আর তোমাদের ঐ সম্পদ নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিয়ো না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন। (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।[৪৮]

৬.৭. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করা

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সুবিচার ছাড়া মানুষের সম্মান, আত্মসম্মান, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সাম্য সর্বোপরি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে আইনের শাসনের ওপর।

---

৪৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৩৩

৪৭. আল-কুরআন, ১৩ : ১১

৪৮. আল-কুরআন, ৪ : ৫

আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের বহু স্থানে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফেরত দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।[৪৯]

এ আয়াতে 'আমানত' ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করার অর্থেই আমানত আদায় করা বুঝায়।

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।[৫০]

এ আয়াতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করাও এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এটি শুরু হয় বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করার মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শরী'আহ্ কতগুলো নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- সুদ, জুয়া, জুলুম, সম্পদ আত্মসাৎ ও মজুত করা, ঘুষ, প্রতারণা, দুর্নীতি, ধোঁকা ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয় দূর করা। বিপরীতে ইসলামী শরী'আহ্ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করতে উৎসাহিত করে, যাতে সমাজের সকলে সমানভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। ইসলামী শরী'আহ্ এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে কৃষকের যথার্থ মূল্যায়ন হবে, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত হবে, ব্যবসায়ীরা যুক্তিসঙ্গত মুনাফা অর্জন করতে পারবে– এমনিভাবে সকল অর্থনৈতিক পক্ষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত হবে। নিচে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কিছু উপাদান তুলে ধরা হলোঃ

৬.৭.১. রিবা বা সুদ নিষিদ্ধ

রিবা বা সুদ একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক জুলুম। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টিতে সুদের জুড়ি নেই। এ কারণে ইসলাম চিরতরে সুদ নিষিদ্ধ করেছে। সুদ নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।[৫১]

---

৪৯. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

৫০. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

৫১. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৬.৭.২. একচেটিয়া কারবার নিষিদ্ধ

সর্বাধিক সমাজ কল্যাণ সাধন করা ইসলামী শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য। কাজেই যেসব উপাদান এ উদ্দেশ্যের অন্তরায় তা অবশ্যই বর্জনীয়। একচেটিয়া কারবারের মালিকগণ অতি মুনাফার আশায় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় বলে উৎপাদন কমে যায়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে তা শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাই একচেটিয়া কারবার অর্থনৈতিক সুবিচারের পরিপন্থী বলে ইসলামী শরী'আহ্তে তা সমর্থিত নয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং বিশেষ ধরনের ওষুধপত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারের সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। কারণ এগুলো পরিচালিত হয় জনকল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে মুনাফা সর্বোচ্চ করাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

৬.৭.৩. ফটকা কারবার নিষিদ্ধ

ইসলামে ফটকা কারবার নিষিদ্ধ। কারণ এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুর্নীতির রাস্তা তৈরি করে। ফটকা কারবারিগণ সস্তায় পণ্য কিনে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে আটক রাখে। ফলে পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে। এ কারণে পণ্য উৎপাদনকারী কম দামে পণ্য বেচে দিতে এবং প্রকৃত খরিদ্দার বেশি দামে তা কিনতে বাধ্য হয়। মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী ফটকা কারবারিরা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে। ইসলামে এ জাতীয় কেনাবেচা নিষিদ্ধ। তাই শরী'আহ্ পণ্য বিক্রির শর্ত করে বিক্রির সময় পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে। হাকিম ইবনে হিযাম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না।[৫২]

৬.৭.৪. বাজি ধরা ও কারবারি জুয়া নিষিদ্ধ

ইসলামে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ। শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে জুয়া খেলাই নিষিদ্ধ নয়; বরং ব্যবসার নামে যেসব বাজি রাখা হয়, সেগুলোও নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। জুয়ার মাধ্যমে একপক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিনা পরিশ্রমে মুনাফা লাভের আশায় বহু মানুষ জুয়ায় অংশগ্রহণ করে শুধু সর্বস্বান্তই হয়ে পড়ে না; বরং গোটা অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। এ ছাড়া জুয়া ও বাজি রাখা নৈতিক চরিত্রের জন্যও অত্যন্ত লজ্জাকর ও অপমানের বিষয়। এটি সমাজের মাঝে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করে এবং মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও ভদ্রতা ধ্বংস করে ফেলে। জুয়া নিষিদ্ধ করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

---

৫২. ইমাম তিরিমিযী, *আল জামি*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : মা জায়া ফি কারাহিয়াতি বাইয়ি মা লাইছা ইনদাকা, হাদীস নং- ১২৩২

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর; এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৫৩]

৬.৭.৫. গারার বা অনিশ্চয়তা ও প্রতারণা নিষিদ্ধ

গারার হলো কোনো ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়িক চুক্তিতে কিংবা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। এ কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়কে 'বাই আল- গারার' বলা হয়। গারার বা অস্পষ্টতার কারণে ব্যবসাবাণিজ্য, স্টক ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজির উদ্ভব হয়। এটি দূর করা হলে ফটকাবাজি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে না। ইসলামে গারার নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ্ স. গারার বা অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৫৪]

৬.৭.৬. কেনাবেচায় ও চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহ্ বা অজ্ঞতা দূর করা

জাহালাহ্ বা অজ্ঞতাও এক ধরনের গারার। জাহালাহ্ হচ্ছে এমন ধরনের লেনদেন যেখানে ক্রেতা জানে না যে, সে কী ক্রয় করছে অথবা বিক্রেতা জানে না যে, সে কী বিক্রয় করছে। জাহালাহ্র একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিক্রীত পণ্যের নির্দিষ্টতা, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের সময় এবং কোথায় পণ্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে তা স্পষ্ট না থাকা। একইভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট না হলে সেখানেও জাহালাহ্র সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় এবং চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহ্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, অনুমান করে পানির নিচের মাছ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কেননা, এখানে মাছের পরিমাণ অজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

পানির নিচের মাছ বিক্রয় করো না। কেননা, এটি অনিশ্চিত বা গারার।[৫৫]

৬.৭.৭. বাই আদ-দাইন বা ঋণ বিক্রয় নিষিদ্ধ

ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করাকে বাই আদ-দাইন বলে। ডিসকাউন্টিং-এর ভিত্তিতে ঋণ বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এখানে পণ্য বিক্রির পরিবর্তে শুধু টাকার বিনিময়ে টাকা

---

[৫৩]. আল কুরআন, ৫ : ৯০

[৫৪]. ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *মুয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ ফিত তিযারাতি ওয়াস সালাম, অনুচ্ছেদ : বাই' আল গারার, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশনস, পৃ. ৪১৬, হাদীস নং- ৭৭৭
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

[৫৫]. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরুত : আল মাকতাবাতু মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯, খ. ৬, পৃ. ১৯৭, হাদীস নং- ৩৬৭৬

বিক্রি হয়, যা অর্থনীতির জন্য খারাপ পরিণতি ডেকে আনে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ্ স. ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৫৬]

৬.৭.৮. মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুতদারি নিষিদ্ধ

মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত করাকে ইহতিকার বা মজুতদারি বলা হয়। মহাজনরা ঋণের নামে সুদে টাকা দিয়ে কৃষকদের নিকট থেকে নামমাত্র দামে খাদ্যশস্য কিনে মজুত করে, আবার সেই খাদ্যশস্য চড়া দামে তাদের কাছে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করে। এর পরিণতিতে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাতের নামান্তর। এ কারণে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তা মজুত করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ 'অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ সংকটের সময় পণ্য মজুদ করে না।'[৫৭]

৬.৭.৯. ঝুঁকিপূর্ণ ভবিষ্যৎ লেনদেন চুক্তি

বাই সালাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহ অনিশ্চিত হলে ভবিষ্যৎ লেনদেন চুক্তি বৈধ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহ না হওয়ার কারণে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। তা ছাড়া এক্ষেত্রে বিক্রেতার দুর্বলতার সুযোগে ক্রেতা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় কম দামে পণ্য কেনে এবং বেশি দামে বেচে। এর ফলে বাজারে পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ স. ফল পাকার আগে কিংবা উঠানোর যোগ্য হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এক্ষেত্রে ফল সরবরাহের পূর্বে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আনাস রা. বলেন, নবী করীম স. ফল না পাকা পর্যন্ত এর ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ফল পেকেছে কিনা তা কিভাবে জানা যাবে? তিনি বলেন, যে পর্যন্ত লাল না হয়, এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে নিতে পারবে যদি আল্লাহ্ ফলগুলোর পাকা বন্ধ করে দেন।'[৫৮]

---

৫৬. নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বকর আল হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, অধ্যায় : আল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : মা নুহিয়া আনহু মিনাল বুয়ু, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৮, খ. ৪, পৃ. ৮০
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

৫৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাহ ওয়া আল-মুজারায়াত, অনুচ্ছেদ : তাহরিমুল ইহতিকার ফিল আকওয়াত, কায়রো : আল-মাকতাবাতু আল-তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ১১, পৃ. ৩১, হাদীস নং- ১৬০৫

৫৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : ইযা বাআআস সামারা কাবলা আন ইয়াবদু ওয়া সালাহুহা সুম্মা আসাবাতহু..., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৯, হাদীস নং-২১৯৮
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له وما تزهي ؟ . قال حتى تحمر . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه)

৬.৭.১০. বাজারের ওপর কৃত্রিম হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ

ইসলামী শরী'আহ্ পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে চায় এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে সমানভাবে লাভবান করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে কেউ যদি বাজারের স্বাভাবিকতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে ও পণ্যের মূল্য নিয়ে খেলা করতে চায় তাহলে ইসলাম তা প্রতিরোধ করে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

কোনো শহরের লোক যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তাদের একজন দ্বারা অপরজনকে রিযিক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।[৫৯]

৬.৮. সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ

প্রতিহিংসা ও মুনাফালাভের লাগামহীন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতি সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। ইসলাম এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সকলের সামাজিক অধিকার পূরণ হবে, কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না এবং সকলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে ইসলামী সমাজে গড়ে উঠবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা হয় তা বৈধ।[৬০]

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾

ভালো কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো।[৬১]

কুরআনের উক্ত নির্দেশনার উদ্দেশ্য হলো সমাজের সামষ্টিক কল্যাণে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচলিনা করা।

৬.৯. দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার সংরক্ষণ

শারীরিক সক্ষমতা ও কাজের সুযোগ থাকার পরও যারা অলস থাকতে ও ভিক্ষা করতে চায়, ইসলামী শরী'আহ্ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এবং কাজ করার নির্দেশ দেয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

---

৫৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : তাহরিমুল বাইয়িল হাজিরি লিল বাদ, কায়রো : আল-মাকতাবাতু আল-তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ১০, পৃ. ১১৮, হাদীস নং- ১৫২২

৬০. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

৬১. আল-কুরআন, ৫ : ২

﴿ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

তোমরা কাজ করে যাও, অবশ্যই আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও বিশ্বাসীগণ।[৬২]

কিন্তু যারা শারীরিকভাবে অক্ষম, অসহায় ও দুর্বল ইসলামী শরী'আহ্ তাদের অধিকারও নিশ্চিত করে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

এবং তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।[৬৩]

অসহায় ও দুর্বলদের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আল-কুরআনে সম্পদশালীদের যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি ঐচ্ছিক দানের নির্দেশও দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

তোমরা কখনো নেকি অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন কিছু (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবহিত।[৬৪]

৬.১০. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। নারীদেরকে বাদ দিয়ে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[৬৫]

উক্ত নির্দেশনার আলোকে বলা যায়, ইসলামী শরী'আহ্ বৈধ সীমার মধ্য থেকে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে। ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে নারী বৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রা. মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ স. মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে আসমা বিনতু আবী বকর রা. উট ও ঘোড়া চরাতেন, পানি পান করাতেন এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করতেন, আটা পিষতেন। ... দু' মাইল দূর থেকে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতেন।[৬৬]

---

৬২. আল-কুরআন, ৯ : ১০৫
৬৩. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯
৬৪. আল-কুরআন, ৩ : ৯২
৬৫. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

৬. ১১. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন

মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা ও বাণিজ্যচক্রের দ্রুত ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাঞ্ছিত প্রবৃদ্ধির হার, সহনীয় মূল্যস্তর ও কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ স্তর অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা ইসলামী শরী'আহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কৃত্রিম মুনাফা, মজুতদারি, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (concentration), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ইসলামী অর্থনীতি এসবের নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধ করে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকে।

ইসলামী অর্থনীতি অর্থনেতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ইসলামী শরী'আহ্ প্রতিরোধমূলক (preventive) ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী শরী'আহ্‌র হাতিয়ার ও কৌশলগুলো নিম্নরূপ :

৬.১১.১. সরকার কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ

ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বাজার পরিচালিত হবে। 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ না হলে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কোনো শক্তিশালী অংশের অশুভ চক্রান্ত না ঘটলে রাষ্ট্র বাজার নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা রাখবে না।' কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। যেমন, উমর রা. আরোপ করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ বাজারে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কিশমিশ বিক্রয় করছে। তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'হয়তো মূল্য বৃদ্ধি করো নতুবা বাজার ত্যাগ করো।'[৬৭]

---

[৬৬] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : আল-গাইরাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩৬, হাদীস নং- ৫২৩৪

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شي غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن و لم اكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ....

[৬৭] ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *মুওয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ' ফিত তিজারাত ওয়াস সালাম, অনুচ্ছেদ : আররাজুলু ইয়াশতারিশ শাইয়া আও ইয়াবিয়াহু ফায়াগবিনু আও ইউসা'য়িরু আলাল মুসলিমিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৯১

عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا

৬.১১.২. অর্থ পণ্য নয়, বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থের নিজস্ব উপযোগ নেই বলে ইসলামে অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না এবং সুদ অর্জনের জন্য একে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয় না। প্রায় ৯০০ বছর আগে ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন, অর্থকে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এর দ্বারা ফটকাবাজি, জুয়া ও কৃত্রিম লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে না।[৬৮]

৬.১১.৩. ঋণের পরিবর্তে ইকুইটি (Equity) ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতি ইকুইটিভিত্তিক। ইসলামী অর্থনীতি ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজির চাহিদা পূরণ করে। ফলে কারবারের মালিকানাকে বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralize) করে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়, যাতে সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টনে বিরাট অবদান রাখে। ঋণনির্ভর আর্থিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অবিচার, অস্থিতিশীলতা ও বাণিজ্যচক্র দূর করতে ইকুইটিভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা কতিপয় অমুসলিম অর্থনীতিবিদও করেছেন।

৬.১১.৪. ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

ইসলামী শরী'আহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেনে ঝগড়া-বিবাদ দূর করা। ইসলামী শরী'আহ্র বিভিন্ন হুকুম-আহকামে এ উদ্দেশ্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ধোঁকা, প্রতারণা, দুর্নীতি ও স্বার্থবাদিতা থেকে বাজারকে মুক্তকরণ এবং যথাযথভাবে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহ্ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চায়। যেমন মুশারাকা বা লাভ-লোকসানে অংশীদারি কারবারে লাভের অনুপাত অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। আবার মুরাবাহা বা লাভে বিক্রয় পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে জানাতে হয়, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে বাই সালাম বা অগ্রিম ক্রয় পদ্ধতিতে পণ্যের ধরন, গুণাগুণ, পরিমাণ, সরবরাহের সময় ও স্থান চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ করতে হয়, যাতে এ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয় লেনদেন চুক্তি লিখে রাখা সংক্রান্ত শরী'আহ্র নির্দেশনার মধ্যে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا... ﴾

---

৬৮. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকী ওসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৭৪

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণের কারবার করো তখন তা লিখে রেখো। ... ছোট হোক বা বড় হোক মেয়াদসহ লিখে রাখতে তোমরা কোনো বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহ্র কাছে এটা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর (ব্যবস্থা)।[৬৯]

৬.১২. আয় ও সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন

ইসলামী শরী'আহ্ শুধু মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তাই দিতে চায় না, বরং সম্পদ ও উপার্জনের ইনসাফভিত্তিক বণ্টনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম এমনভাবে বণ্টননীতি রচনা করে, যাতে 'সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।'[৭০]

ড. উমর চাপরা বলেন, বেশ কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, মুসলিম সমাজে সম্পদের সমতা অপরিহার্য। নবী করীম স.-এর এক সাহাবী আবু যার গিফারী রা. সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন যে, এটা অর্জন করা সম্ভব যদি ধনী লোকেরা নিজেদের প্রকৃত ব্যয় মেটানোর পর সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ তাদের কম সৌভাগ্যবান ভাইদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ব্যয় করে।[৭১]

৬.১৩. কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে তাকে বেঁচে থাকতে হয়। সুখ-শান্তিতে মানুষের বেঁচে থাকা ও তাদের জীবন-মান উন্নত করার প্রয়াসে ইসলামী অর্থনীতি কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতির ওপর জোর দেয়।

কুরআন ও হাদীসে কৃষি কাজের সৌন্দর্যের বহু বর্ণনা রয়েছে। মাটি, পানি ও বৃষ্টিকে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটা আল্লাহ্র নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ-فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ-وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

জমিনকে তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য বানিয়েছেন। তাতে ফল, খোসার আবরণযুক্ত খেজুর, ভূষিযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল রয়েছে। তাহলে তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।[৭২]

---

৬৯. আল কুরআন, ২ : ২৮২

৭০. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৭১. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৭২. আল-কুরআন, ৫৫ : ১০-১৩

রাসূলুল্লাহ স. কৃষি কাজকে সাদাকাহ্ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

যদি কোনো মুসলিম গাছ লাগায় এবং সেখান থেকে মানুষ আহার করে তাহলে তা তার জন্য সাদাকাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়, যদি সে গাছ থেকে চুরি হয় তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হয়। যদি কোনো হিংস্র প্রাণী সে গাছ থেকে খায়, তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হয়। যদি পাখি খায়, তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হয়। যদি কেউ তার ক্ষতি করে, তাও তার জন্য সাদাকাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৭৩]

কিন্তু সবাই যদি শুধু কৃষি কাজ নিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে জাতীয় বিপদাপদ মোকাবেলা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। এ কারণে নবী করীম স. যারা শুধু কৃষিকাজকেই যথেষ্ট মনে করে তাদের সমালোচনা করে বলেছেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

তোমরা যদি সুদভিত্তিক বেচাকেনার কাজ করো ও গরু-মহিষের লেজুড় ধরেই পড়ে থাকো, জিহাদে মনোযোগ না দিয়ে কৃষিকাজে মগ্ন থাকো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। পরে তা দূর করা যাবে না, যতক্ষণ না তোমারা দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।[৭৪]

আল-কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় শিল্পের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রতি নজর দেওয়াকে ফকীহগণ ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মানুষের জন্য প্রয়োজন এমন শিল্প ও পেশায় কেউ-ই যদি অংশগ্রহণ না করে আর এতে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সবাই এর জন্য দায়ী হবে।

আল-কুরআন ও সুন্নাহ্তে বহু জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾

কিছু লোক আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ সফর করবে।[৭৫]

---

৭৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত ওয়াল মুজারাআত, অনুচ্ছেদ : ফাযলুল গারসি ওয়াজজারয়ি, কায়রো : আল-মাকতাবাতু আল-তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ১০, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং-১৫৫২

৭৪. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : আননাহি আনিল 'ইনাহ, হাদীস নং-৩৪৬৪

৭৫. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾

আর তোমরা দেখতে পাও, নদী-সমুদ্রে নৌকা-জাহাজ পানির বক্ষ দীর্ণ করে চলাচল করছে, যেন তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।[৭৬]

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামী অর্থনীতি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটাতে চায়।

৭. ইসলামী অর্থনীতিতে শরী'আহর বিশেষ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আরো কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে ক'টি হলো :

৭.১. অংশীদারি কারবারের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। উৎপাদনের অন্যতম উপাদানও এই পুঁজি। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পুঁজি ও নিজের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা দিয়ে সবসময় বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা। বৃহৎ পুঁজি গঠনের একটি প্রধান মাধ্যম হলো অংশীদারি কারবার। এ অংশীদারি কারবারের মাধ্যমে অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে এবং সকলের যোগ্যতাকে সমন্বয় করে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। এতে করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল অংশীদার লাভবান হতে পারে। সর্বোপরি ইসলামী সমাজের ভ্রাতৃত্ব ও ভালো কাজে সহযোগিতার বিষয়টিও অংশীদারি পদ্ধতির মাধ্যমে বেড়ে যায়। তাই বলা যায়, মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামে অংশীদারি ব্যবসাকে বৈধ করা হয়েছে।

৭.২. ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

কোনো মানুষই এককভাবে নিজের সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। একজনের কাছে হয়তো এক ধরনের পণ্য আছে, কিন্তু তার প্রয়োজন অন্য ধরনের পণ্য। এই প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই পরস্পরের মধ্যে ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন জরুরি। তাই বলা যায়, ক্রয়বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইসলামী শরী'আহ্তে এটিকে বৈধ করা হয়েছে। ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন :

ثلاث فيهن البركة . البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

---

৭৬. আল-কুরআন, ৩৫ : ১২

'তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত নিহিত। বাকিতে বিক্রয়, মুকারাদাহ্ (মুদারাবাহ্) এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবের সঙ্গে গম মেশানো।'[৭৭]

সুদের বিনিময়ে ঋণের আদান-প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থ ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উৎপাদন সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতি অনুশীলনে প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তুনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল। যে কারণে সমাজে কৃত্রিম অর্থ সৃষ্টির সুযোগ কমে যায় এবং আর্থিক মন্দা ও অস্থিতিশীলতার কবল থেকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পদ নিরাপদ হয়।

৭.৩. যাকাতের উদ্দেশ্য

যাকাত ইসলামের এক অনন্য মৌলিক বিষয়। আল-কুরআনে সালাত ও যাকাতকে আটাশ স্থানে এবং হাদীসে এ দুটিকে দশ-দশটি স্থানে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতে ইবাদতের ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তাতে একটা মানবিক কল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে আছে। এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিককেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় যেমন, তেমনি নয় নিছক সামষ্টিক। তার অনেকগুলো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয়, সে যাকাতদাতা হোক কি গ্রহীতা। আবার তার অনেকগুলো ভাবধারা মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত হয় তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে, কল্যাণময় দায়িত্বের সম্প্রসারণে এবং তার সমস্যাসমূহ সুষ্ঠু সমাধানে।[৭৮] যাকাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক'টি হলো :

৭.৩.১. দারিদ্র্য বিমোচন ও অভাবীদের চাহিদা পূরণ

যাকাতের প্রধান লক্ষ্য হলো দরিদ্রকে সচ্ছল করে দেয়া। ফকীর ও মিসকীন হলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রধান খাত। মহানবী স. কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল এ খাতটির কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রথমত এটিই যাকাতের উদ্দেশ্য।[৭৯] যেমন তিনি বলেছেন, تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 'তাদের ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তা তাদের ফকীরদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'[৮০]

৭.৩.২. ধনীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সম্পদের পবিত্রতা বিধান : যাকাতের একটি উদ্দেশ্য হলো, যাকাতদাতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার ধনসম্পদ ও আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন,

---

৭৭. ইমাম ইবনু মাজাহ, *সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আশ-শিরকাহ ওয়াল মুদারাবা, ঢাকা : আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামীয়্যাহ, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং-২২৮৯

৭৮. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ২, পৃ. ৩৯৩

৭৯. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৯৯

৮০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : উজুবুয্ যাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮২, হাদীস নং ১৩৯০

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ আদায় করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবে।[৮১]

বস্তুত ধনীর সম্পদে দুর্বল-অক্ষম ও ফকীরদের অধিকার মিশে আছে। ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তাদের সম্পদকে পবিত্র করা যায়। আর এ অধিকার আদায়ের মাধ্যমে ধনীর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। তার উদারতা, বিশালতা ও আত্মিক ঐশ্বর্য বেড়ে যায়।

৭.৩.৩. সামাজিক সহযোগিতা ও সম্পদের আবর্তন : যাকাতের উদ্দেশ্যের আরো কতক দিক হলো ধনী ও গরিবের মাঝে সামাজিক সহযোগিতা সৃষ্টি করা, আয়-বৈষম্য হ্রাস করা ও সম্পদের আবর্তন ঘটানো। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।[৮২]

৭.৩.৪. সামষ্টিক কল্যাণ বৃদ্ধি : যাকাত সামষ্টিক উৎপাদন ও উন্নয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে সামষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা র. বলেন,

'সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ তার সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজনের কাছে যে অর্থ আছে তা যদি অন্য এক ভাইয়ের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয়, তবে এ অর্থই আবর্তিত হয়ে অভাবিতপূর্ব কল্যাণ নিয়ে পুনরায় তার হাতেই ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে যদি সে তা নিজের কাছেই সঞ্চয় করে রাখে কিংবা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থজনিত কাজে ব্যয় করে, তবে ফলত সে অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি এতিম শিশুকে যদি লালন-পালন করা হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উপার্জনক্ষম করা হয়, তবে তাতে সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয় করে এ কাজ করেছে সে তা থেকে অংশ লাভ করতে পারবে। কারণ, উভয় ব্যক্তিই একই সমাজের লোক।'[৮৩]

৭.৪. সুদ নিষিদ্ধের কারণ ও যৌক্তিকতা

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

মানুষের ধন-সম্পদ বেড়ে যাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বাড়ায় না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো তা বেড়ে যায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।[৮৪]

---

৮১. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩
৮২. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
৮৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা, *ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৮৫
৮৪. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

সুদ হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী র. তাঁর তাফসীরে যা লিখেছেন তার সারমর্ম দাঁড়ায়, সুদের কোনো বিনিময় মূল্য নেই। এটা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হরণ করার শামিল। সুদের ওপর নির্ভরতা মানুষকে শ্রমবিমুখ করে তোলে। ফলে শ্রম করে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে খাটাখাটুনির কোনো প্রয়োজন বোধই করবে না মানুষ এবং এর দরুন সামাষ্টিক কল্যাণ ব্যবস্থা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। আর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন না হলে মানব-সাধারণের কোনো কল্যাণের চিন্তা বা আশাই করা যায় না। সুদি ঋণদান ব্যবস্থা চালু থাকলে ধনী আরো ধনী হবে এবং গরিব হবে আরো গরিব। কারণ সাধারণত সুদ খায় ধনীরা আর দেয় গরিবরা।[৮৫]

উপসংহার

বর্তমানে অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতি ও ব্যাংকিং মানুষের কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বারবার অর্থনৈতিক মন্দা বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছে। সুদভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ধনীকে আরো ধনী এবং নিঃস্বকে করেছে নিঃস্বতর। এ ক্ষেত্রে শরী'আহ্ভিত্তিক কল্যাণমুখী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম। সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক মন্দা, অস্থিতিশীলতা, চরম দারিদ্র্য, বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যের আলোকে চিন্তাগবেষণার জন্য ইসলামী স্কলারদের আরো বেশি আত্মনিয়োগ করা জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের এই মানবজাতি। তিনি এই মানুষের প্রতি করেছেন করুণা এবং তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতিকে দেয়া হয়েছে একই দ্বীন বা জীবনবিধান এবং সময়োপযোগী করে দেয়া হয়েছে শরী'আহ্ বা আইন-কানুন। মহান আল্লাহ্র আইন-কানুন ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি যেমন মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন, তেমনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে সুন্দর ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্যও প্রণয়ন করেছেন বিভিন্ন আইন-কানুন। প্রকৃতি জগতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত আইন-কানুন অনুসৃত হচ্ছে বলেই সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। তেমনিভাবে অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্র নীতি-পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে থাকতো না শোষণ-জুলুম ও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা।

---

৮৫. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ : একটি ফিক্‌হী পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ:** *'নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ পদ্ধতি' ফিক্‌হের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। নিখোঁজ ব্যক্তি মৃত গণ্য হবে নাকি জীবিত- এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য না থাকার কারণে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত ও মতবিরোধপূর্ণ। বিশিষ্ট সাহাবী 'আলী রা. ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রা. সুনির্দিষ্ট সংবাদ না আসা পর্যন্ত স্ত্রীকে অপেক্ষা করার মত দিয়েছেন। তবে কার্যনির্বাহের সুবিধার্থে এ সময়কে ৯০ বছর মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। 'উমর রা., 'উসমান রা., ইবনু 'উমর ও ইবনু 'আব্বাস রা. প্রমুখ সাহাবীগণ চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত ব্যক্ত করেছেন। মালিকী ও হাম্বলী ফকীহগণ উক্ত মত গ্রহণ করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ফখরুদ্দীন আয-যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৪৩ হি.), ইবনু 'আবিদীন (মৃ. ১২৫২ হি.), ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (মৃ. ৯৭০ হি.) ও হাম্বালী ফকীহ ইবনু 'উসাইমীন রহ. প্রমুখ বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ না করে বিষয়টি আদালতের নিকট ন্যস্ত করাই অধিক যৌক্তিক হিসেবে অভিমত দিয়েছেন। দলীল-প্রমাণের আলোকে শেষের মতটি অধিকতর যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত প্রতিপাদ্য হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কতদিন পর নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে- এ বিষয়ে সাহাবা কিরাম থেকে নিয়ে বিভিন্ন ইমামগণের মতামতসহ সাম্প্রতিক কালের ফকীহগণের মতসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মৃত মানুষের স্ত্রীর বিধান সুস্পষ্টভাষায় বর্ণিত হলেও নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিধান স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হয়নি। তাই দেখা যায়- বিষয়টি সাহাবা কিরামের যুগ থেকেই মতবিরোধপূর্ণ। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (মৃ.৭২৮ হি.) বলেন, সাহাবা কিরামের যুগে যেসব বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং যে সব বিষয় নিয়ে পরবর্তী ফিক্‌হবিদগণ অধিক জটিলতায় পড়েছেন, তন্মধ্যে 'নিখোঁজ' এর স্ত্রীর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।[১] এ বিষয়ে অনেক ফিক্‌হবিদ বার বার মত পরিবর্তন

---

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. وَمِنْ أَشْكَلِ مَا أَشْكَلَ عَلَى الْفُقَهَاءِ مِنْ أَحْكَامِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
(ইবনু তাইমিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, মদীনা : মাজমা'উল মালিক ফাহাদ, ১৯৯৫ খ্রি., খ. ২০, পৃ. ৫৭৬)

করেছেন, এমনকি হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ মালিকী মাযহাবানুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন এবং সেটিকে ইজমা'তে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। ভারত উপমহাদেশে 'Muslim Family Laws' হিসেবে রচিত সরকারী বিভিন্ন এক্টের (Act) মধ্যেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে 'নিখোঁজ' এর সংখ্যা অতীতের তুলনায় বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার। বিষয়টি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আরো পর্যালোচিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে বর্তমানের বিমান দুর্ঘটনা, লঞ্চডুবি, ভবনধসসহ অসংখ্য অপহরণের ঘটনা ঘটে চলেছে, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জীবিত কিংবা মৃত কোনোভাবেই বিবেচনা করা যায় না।

'নিখোঁজ'-এর পরিচিত

শাব্দিক অর্থ: 'নিখোঁজ'-এর অর্থ খোঁজ পাওয়া যায় না এমন, পাত্তাহীন, নিরুদ্দেশ, উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, সন্ধানশূন্য।[২] ইংরেজিতে এর অর্থ 'Having no destination'।[৩] আইনের পরিভাষায় এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Missing Person'।[৪] হাদীসশাস্ত্র ও ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় এর আরবী প্রতিশব্দ 'مفقود' অর্থাৎ সন্ধানহীন।

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামী শরী'য়তের পরিভাষায় 'নিখোঁজ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি পরিবার-পরিজন থেকে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন, যার বেঁচে থাকা কিংবা মৃত্যুবরণ করা কোনোটি নিশ্চিত নয়।[৫]

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আদ-দাসূকী আল-মালিকী (মৃ. ১২৩০ হি.) বলেন, "وَالْمَفْقُودُ من لم يُعْلَمْ مَوْضِعُه" নিখোঁজ ঐ ব্যক্তি যার অবস্থান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় না।[৬] বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু নুজাইম আল-মিসরীর (মৃ. ৯৭০ হি.) মতে, 'নিখোঁজ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জীবন কিংবা মৃত্যু কোনোটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগতি লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যু অজ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি মুখ্য, স্থানের অজ্ঞতা ধর্তব্য নয়।[৭] ফিক্‌হে হানাফীর প্রসিদ্ধ ফিক্‌হবিদ আবূ

---

২. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৬৮১; এস. কে আহমদ, *জয় আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল, পৃ. ৪৭৪

৩. *Bengali- English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 2012, p. 371

৪. Dr. Muhammad Ekramul Haque, *Islalmic Law of Inheritance*, Dhaka : London College Of Legal Studies, 2009. p. 233

৫. هُوَ مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ ، وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ مِنْ مَمَاتِه
(*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েতঃ ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়, খ. ২, পৃ. ১০৫)

৬. মুহাম্মদ আদ-দাসূকী, *হাশিয়াতুত্ দাসূকী আলাশ্ শরহিল কবীর*, বৈরূত, দারুল ফিকর, খ. ৩, পৃ. ৩০২

৭. يَعْنِي لم تُدْرَ حَيَاتُهُ وَلا مَوْتُهُ فَالْمَدَارُ إِنَّمَا هو على الْجَهْلِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ لا على الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ

বকর আল-হাদ্দাদ আল-হানাফী (মৃ. ৮০০ হি.) বলেন, নিখোঁজ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ঘর থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, অতঃপর কোন দিকে গেলো, কোথায় গেলো, কী হলো? বেঁচে আছে নাকি মৃত্যুবরণ করেছে, কিংবা শত্রু বন্দী করে থাকলে বাঁচিয়ে রেখেছে নাকি হত্যা করেছে, কোনোটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।[৮] ড. ওয়াহ্বা আয-যুহাইলী বলেন, নিখোঁজ হলো ঐ ব্যক্তি যার বেঁচে থাকা কিংবা মৃত্যবরণ করা কোনোটি সুনিশ্চিত নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> যে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজন ও বসতি এলাকা হইতে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে অথবা যাহাকে শত্রুরাষ্ট্রের লোকেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, অতঃপর সে জীবিত আছে কি না? বা কোথায় আছে তাহা একটি উল্লেখযোগ্যকাল যাবত অজ্ঞাত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে 'মাফকূদ' বলে।[৯]

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (মৃ.১০৫৮ খ্রি.) বলেন,

> মৃত্যুতে কোনো ধরনের সন্দেহ থাকলে সে নিখোঁজ গণ্য হবে। সন্দেহের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক তা ধর্তব্য নয়। তাই নিজ শহর থেকে হারিয়ে যাওয়া, জল কিংবা স্থল পথে কোনো দূর সফরে হারিয়ে যাওয়া বা কোনো বাহন বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যাওয়া; সবগুলো 'নিখোঁজ'এর অন্তর্ভুক্ত।[১০]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জীবন-মরণ সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ থাকলে সে নিখোঁজ বলে গণ্য হবে; অন্যথায় নয়। বেঁচে থাকা নিশ্চিত হলে জীবিত আর মৃত্যু নিশ্চিত হলে মৃত, যদিও লাশ পাওয়া না যায়। এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজন থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে, তবে তার জীবিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত,

---

(ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা.বি., খ. ৫ পৃ. ১৭৬)

৮. هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي جِهَةٍ فَيُفْقَدُ وَلا تُعْرَفُ جِهَتُهُ وَلا مَوْضِعُهُ وَلا يَسْتَبِينُ أَمْرُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ وَلا يَسْتَبِينُ أَمْرُهُ وَلَا قَتْلُهُ وَلا حَيَاتُهُ

(আবূ বকর আল ইয়ামানী, *আল-জাওহারাতুন্ নাইয়িরাহ*, আল-মাতবা'আতুল খাইরিয়্যাহ, ১৩২২ হি., খ. ১, পৃ. ৩৬০)

৯. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি., খ. ১, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬৮২

১০. سَوَاءٌ قَعَدَ فِي بَلَدِهِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فِي بَرٍّ كَانَ سَفَرُهُ أَوْ فِي بَحْرٍ ، وَسَوَاءٌ كُسِرَ مَرْكَبُهُ أَوْ فُقِدَ بَيْنَ صَفَّيْ حَرْبٍ فَهُوَ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ كُلِّهَا مَفْقُودٌ

(আল-মাওয়ারদী, *আল-হাভী আল-কবীর*, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ১১, পৃ. ৭১৪)

তাহলে সে 'নিখোঁজ' গণ্য হবে না। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনাকবলিত হয়- যেমন কোনো বহুতল ভবন ধ্বসে পড়লো, কারখানায় আগুন লাগলো, লঞ্চ ডুবে গেলো, বিমানদুর্ঘটনা ঘটলো; কিছু লোক জীবিত কিংবা মৃত উদ্ধার করা গেলেও আর কিছু লোক উদ্ধারকর্ম শেষেও জীবিত কিংবা মৃত উদ্ধার হলো না। অথচ ঘটনার মুহূর্তে তারা সেখানে উপস্থিত থাকার বিষয়টি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে এসব লোক নিখোঁজ হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ তাদের মরদেহ পাওয়া না গেলেও তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত। তবে কেউ যদি মসজিদে বা বাজারে যায়, কিন্তু আর ফিরে না আসে কিংবা বিদেশে পাড়ি দেয় আর যোগাযোগ না থাকে, তাহলে এ জাতীয় লোক নিখোঁজ গণ্য হবে। এক কথায়, লাশ পাওয়া না গেলেও যদি মৃত্যু নিশ্চিত হয়, তাহলে সে 'নিখোঁজ' নয়, বরং মৃত (এ কারণেই পত্রিকার ভাষায় এ জাতীয় ঘটনায়, নিখোঁজ এর সাথে লাশ শব্দও যোগ করা হয়।)। আর যদি মৃত্যুর বিষয়ে সামান্যতমও সন্দেহ থাকে, তাহলে সে মৃত নয়; বরং নিখোঁজ।

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ

ক. স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ পদ্ধতি

সর্বজনবিদিত বিষয় হলো, ইসলামী আইনে উপযুক্ত দু'জন সাক্ষীর সম্মুখে দু'জন নারী-পুরুষ (পুরুষ কর্তৃক নারীকে 'মহর' প্রদান করার শর্তে) যে বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে বিবাহবন্ধন বলে। এ বন্ধন আজীবন ও আমরণ, যতক্ষণ না এর বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। ইসলামী শারী'আত যথাসম্ভব বিবাহবন্ধনকে অটুট রাখার জন্য উৎসাহিত করেছে এবং বিচ্ছেদ ঘটানোকে নিরুৎসাহিত করেছে, তথাপি এটিকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট বৈধকর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে। কারণ এর কুফল দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী। তবে ইসলাম যেহেতু একটি বাস্তবধর্মী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তাই একান্ত প্রয়োজনে এ বন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যবস্থাও এতে রাখা হয়েছে। তবে এ সুযোগ যৌক্তিক কারণে স্ত্রীর তুলনায় স্বামীকে বেশি প্রদান করা হয়েছে। কারণ ইসলামে বিবাহবন্ধনকে অর্থবহ ও টেকসই করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের লেনদেনকে আবশ্যিক করা হয়েছে। এর নাম 'মহর'। এ মহর স্বামীই দিয়ে থাকে। তাই বিনা প্রয়োজনে সে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে না। অপর দিকে স্ত্রীকে এক্ষেত্রে অবাধ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়া হলে সে বার বার 'মহর' লাভের লোভে স্বামী পরিবর্তন করে স্বামী বেচারাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন করতে পারে। তাই স্ত্রীর জন্য এ সুযোগ ক্ষীণ ও শর্তসাপেক্ষ। এরকম তারতম্য করার মাধ্যমে উভয়ের সুযোগ ভারসাম্যপূর্ণ ও সমতাপূর্ণ করা হয়েছে। তাই স্বামী যে কোনো সময় যে কোনোভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা রাখে। সে আদালতের শরণাপন্ন না হয়ে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তবে উল্লেখ থাকে যে, দাম্পত্যজীবন সুখকর হওয়ার জন্য 'মহর প্রদান' ছাড়াও স্বামীর আরো কর্তব্য রয়েছে। যেমন- ভরণ-পোষণ প্রদান করা, স্ত্রীর

যৌনচাহিদা পূরণ করা, সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি। যদি স্বামী বিবাহপরবর্তী করণীয় পালনে অবহেলা প্রদর্শন করে বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে স্ত্রী তিনটি পদ্ধতির একটির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। পদ্ধতি তিনটি যথাক্রমে-

১. **খুলা ও মুবারাত** (الخلع والمبارأة) (Khula and Mubara'at) খুলাতে স্ত্রী বিবাহবন্ধনে বিতৃষ্ণ হয়ে বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং স্বামীর সুবিধার জন্য তার দেনমোহরের দাবি ও অন্যান্য অধিকার পরিত্যাগ করে। আর মুবারাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বিবাহে বিতৃষ্ণ হয়ে লেনদেনের বিনিময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হয়।

২. **বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা অর্পণ** (طلاق تفويض) (Delegation of Power to Divorce) যদিও তালাকের মালিক স্বামী; কিন্তু এ ব্যবস্থায় সে তালাক প্রদানের ক্ষমতা স্ত্রীকে বা কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে শর্ত সাপেক্ষে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে প্রদান করে থাকে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তখন ঐ ক্ষমতানুযায়ী তালাক দিতে পারে।

৩. **বিচারক কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদ** (التفريق بالحاكم) (Dissolution of Marriage by Judicial Process) উপরের পদ্ধতি দু'টি কার্যকর না হলে স্ত্রী আদালতে আপত্তি উত্থাপন করে বিচারকের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। নিম্নে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী কিভাবে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাবে সে নিয়ে আলোচনা করা হলো।

খ. 'নিখোঁজ' -এর স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

'নিখোঁজ' ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা পোষণ করলে তার জন্য বিবাহবিচ্ছেদের উপরিউক্ত তৃতীয় পদ্ধতিটি প্রযোজ্য হবে। সে বিচারকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। তবে কতকাল যাবৎ তাকে স্বামী ফিরে আসার অপেক্ষা করতে হবে, কী পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে আদালত কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে- এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা আবশ্যক, কিন্তু সাহাবা কিরামের যুগ থেকেই বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। সাহাবা, তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ী ও ইমামগণের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল মতামত প্রধান তিনটি মতে একীভূত। মতামত তিনটি যথাক্রমে-

প্রথম মত : সমবয়সী সকল লোকের মৃত্যুর পরই মৃত ঘোষিত হবে

লক্ষণীয় যে, সকল ফিক্হবিদ 'নিখোঁজ ব্যক্তি'র বিষয়ে এ সিদ্ধান্তে একমত যে, তার মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় যথা- স্ত্রীর 'ইদ্দত পালন, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ, মীরাস বণ্টন, কর্তৃক স্বামীর মৃত্যু জনিতসহ যাবতীয় বিষয় আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তি আদালত কর্তৃক মৃত ঘোষিত হবে ততক্ষণ তার মৃত্যুসম্পর্কিত সকল বিধান স্থগিত থাকবে। তবে কত দিন বা কত মাস পর আদালত তাকে মৃত ঘোষণা করবে, এ ব্যাপারে সাহাবীগণের মাঝে 'আলী রা. ও 'আব্দুল্লাহ

ইবনু মাসউদ রা. এবং তাবিয়ীদের মাঝে ইব্রাহীম আন-নাখা'ঈ, আবূ কিলাবাহ, শা'বী, জাবির বিন যায়দ, হাকাম, হাম্মাদ, ইবনু আবী লায়লা, ইবনু শুবরুমা, 'উসমান আল-বাত্তী, সুফইয়ান আস-সওরী, হাসান বিন হাই প্রমূখ তাবিয়ীগণ এবং ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মত হলো, উক্ত স্ত্রী স্বামীর সুনির্দিষ্ট সংবাদ আসা পর্যন্ত তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং আদালত যতদিন তার সকল সমবয়সী লোকের মৃত্যু না হবে ততদিন তাকে মৃত ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকবে। অনেক মুহাদ্দিস এবং সকল কূফী ফিক্‌হবিদ এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী রহ-এরও পরবর্তী অভিমত এটি।[১১] নিম্নে এ মতের সমর্থনকারী দলীলসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

এক.

عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر

মুগীরা বিন শু'বা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী ঐ পর্যন্ত তার স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে, যতদিন তার বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সংবাদ না আসবে।[১২]

দুই.

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ

হাকাম বিন 'উতাইবা হতে বর্ণিত, 'নিখোঁজ'-এর স্ত্রী সম্পর্কে 'আলী রা.-এর বক্তব্য হলো, সে একজন বিপদগ্রস্ত মহিলা। অতএব স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের নিশ্চিত সংবাদ আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করাটাই তার করণীয়।[১৩]

তিন. নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না

ফিক্‌হের একটি মূলনীতি হলো, কোনো নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না এবং কোনো অনিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন, 'الْيَقِينُ لا يُزَالُ بِالشَّكِّ'[১৪]। তাকী উদ্দীন আস-সুবকী (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেন, 'اليقين لا يرفع بالشك' অর্থাৎ পূর্বে প্রমাণিত কোনো নিশ্চিত বিষয় পরবর্তী সৃষ্ট কোনো সংশয়-সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না।[১৫] এমনিভাবে বিশিষ্ট ফকীহ 'আলাউদ্দিন আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন,

---

১১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৮, পৃ. ২৬৮

১২. দারাকুত্‌নী, *আস্-সুনান*, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, খ. ৪. পৃ, ৪৮৩, হাদীস নং- ৩৮৪৯

১৩. 'আব্দুর রায্‌যাক, *আল-মুসান্নাফ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি., খ.৭, পৃ .৯০, হাদীস নং- ১২৩৩

১৪. সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান্ নাযায়ির*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫০

১৫. তাকীউদ্দিন আস-সুবকী, বৈরূত : *আল-আশবাহ-ওয়ান নাযায়ির*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৩

إن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك والثابت بيقين لا يزول بالشك

নিশ্চিতভাবে অপ্রমাণিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এমনিভাবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা বিলুপ্ত হয় না।[১৬]

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِى دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় পেছনে বায়ু নির্গত হওয়ার মত কিছু অনুভব করে, বাস্তবিকপক্ষে তার বায়ু নির্গত হোক বা না হোক, কিন্তু সে সংশয়ে পতিত হলো, তাহলে সে নামায ভঙ্গ করবে না, যতক্ষণ না বায়ু নির্গত হওয়ার কোনো শব্দ বা দুর্গন্ধ অনুভব করে।[১৭]

যেহেতু নামাযরত ব্যক্তি প্রথম থেকে তার অযুর বিষয়ে নিশ্চিত, তাই সন্দেহপূর্ণ বায়ুর কারণে তার অযু ভঙ্গ হবে না। অতএব সে নামায বহাল রাখবে এবং সমাপ্ত করবে। এ হাদীসের আলোকে ফিক্হবিদগণ উপর্যুক্ত মূলনীতিটি উদ্ভাবন করেছেন যে, কোনো নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না, তদ্রূপ কোনো অপ্রমাণিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

আলোচ্য বিষয়ে যেহেতু, নিখোঁজ এর সাথে তাঁর স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তাই নিখোঁজ কর্তৃক তালাক প্রদান বা তার মৃত্যু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অটুট ও অটল থাকবে। তাই তার সমবয়সী সকল লোকের মৃত্যুর পরেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হবে। তার সমবয়সী একজন লোকও যদি জীবিত থাকে, তাহলে তাকে জীবিত গণ্য করা হবে এবং স্ত্রীও তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তবে সকল সমবয়সীলোকের মৃত্যু হওয়া না হওয়া বিষয়টি প্রমাণ করা যেহেতু অনেক জটিল, তাই ফিক্হবিদগণ কার্যনির্বাহের সুবিধার্থে এর জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণের প্রয়াসী হয়েছেন। এক্ষেত্রে ১২০, ১০০, ৯০, ৮০, ৭০ ও ৬০ প্রভৃতি একাধিক মত পাওয়া যায়। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর মতে তার জন্ম তারিখ হতে ১০০ বছর পূর্ণ হলে, আল-হাসান ইবনু যিয়াদ আল-লুলুয়ী রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতানুযায়ী তার জন্ম তারিখ হতে ১২০ বছর পূর্ণ হলে, বিশিষ্ট ফকীহ ইবনুল হুমাম রহ-এর মতে ৭০ বছর পূর্ণ হলে, এবং পরবর্তীকালের অনেক ফকীহের মতে ৬০ বছর পূর্ণ হলে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে।[১৮] কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

---

১৬. 'আলাউদ্দিন আল-কাসানী, *বাদায়ি'উস্ সানায়ি'*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩৪০

১৭. আবূ দাউদ, *আস্-সুনান*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪৫, হাদীস নং-১১৭

১৮. ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ১৭৮

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ، إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক ৬০ থেকে ৭০ বছর বেঁচে থাকবে। কম লোকেই এ সীমা অতিক্রম করবে।[১৯]

তবে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ গ্রন্থে নব্বই বছরের ওপর ফাতওয়া প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় মত : চার বছর পর মৃত ঘোষিত হবে

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা করলে বিষয়টি আদালতে উত্থাপন করবে, আদালত স্ত্রীকে চার বছর সময় অপেক্ষা করার ফরমান জারি করবে। চার বছর সমাপ্ত হওয়ার পর স্ত্রী পুনরায় আদালতকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি অবহিত করবে। আদালত তখন তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করবে। মৃত ঘোষিত হওয়ার পর স্ত্রী চার মাস দশ দিন স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত পালন শেষে স্ত্রী স্বামীর বিবাহবন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যাবে এবং চাইলে তখন দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। সাহাবীগণের মাঝে 'উমর রা., 'উসমান রা., ইবনু 'উমর রা., ইবনু 'আব্বাস রা., ইবনুয্ যুবাইর রা. প্রমুখ এ মতটি গ্রহণ করেন। ইবনু মাস'উদ ও 'আলী রা. থেকেও অনুরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে। ইমামগণের মাঝে ইমাম মালিক রহ. এ মতটি গ্রহণ করেন। হম্বালী ফকীহগণও এ মতটি গ্রহণ করেছেন, তবে শর্ত হলো, ঘটনাটি মৃত্যুর প্রবল সম্ভাবনাময় হতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এরও প্রথম মত এটি ছিল।[২০] হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ নিজেদের মাযহাব বর্জন করে এ মতানুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন। বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর আল-হীলাতুন নাজিযা গ্রন্থে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তৎকালীন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের নিকট একাধিকবার চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ বিষয়ে ফাতওয়া তলব করেছেন এবং তা ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট হানাফী ফকীহগণের নিকট পেশ করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে মালিকী মাযহাবের সিদ্ধান্তকে ইজমা'তে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে[২১] ভারত উপমহাদেশের মুসলিম

---

১৯. ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪১৫. হাদীস নং-৪২৩৬

২০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৮, পৃ. ২৬৮-৬৯

২১. A married Muslim Woman may obtain a decree dossolving her marriage. A lucid exposition of this principle can be found in the book called 'Heelat-un-Najeza' published by Maulana Ashraf Ali Sahib who has made an anexhaustive study of the provison of Maliki Law which under the circumstances prevailing in India may be applid to such case. This has been approved by a large number of Ulemas who put their seals of approval on the book
[ASAF A.A. FYZEE, *Outlines of Muhammadan Law*, Delhe, Oxford University Press, p. 170.]

পারিবারিক আইনে Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 নামে রচিত অর্ডিনেন্সে হানাফী মাযহাবের পূর্বের সিদ্ধান্ত বর্জন করে মালিকী মাযহাব অনুসারে চার বছর অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ASAF A.A. FYZEE, Missing husband সম্পর্কে বলেন,

> The wife is entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage if the whereabouts of the hasband have not been known for a period of four years.[22]

প্রমাণ এক.

عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَالَ:أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

সা'ঈদ ইবন্ মুসায়্যাব রা. হতে বর্ণিত, 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, যে কোনো স্ত্রী স্বামীকে হারিয়ে ফেলবে এবং কী অবস্থায় আছে তা না জানবে, সে চার বছার পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। চার বছর শেষে সে চার মাস দশ দিন ইদ্দাতে ওফাত পালন করবে। অতঃপর সে বৈবাহিক বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবে (ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে)।[২৩]

প্রমাণ দুই.

عن أبي عثمان قال : أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولى الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا.

আবূ 'উসমান রা. হতে বর্ণিত, একদা এক নারী 'উমর র.-এর নিকট তাঁর স্বামী জ্বীন কর্তৃক উধাও হওয়ার অভিযোগ করলেন, তখন 'উমর রা. তাকে চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উক্ত নারীকে তালাক দেয়ার জন্য জ্বীনগ্রস্ত ব্যক্তির অভিভাবককে নির্দেশ দিলেন। তারপর ঐ নারীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দতে ওফাত পালন করার আদেশ দিলেন।[২৪]

প্রমাণ তিন.

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَذَاكَرَا امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا: تَرَبَّصُ بِنَفْسِهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ

জাবির বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, একদা সে ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন তারা উভয়ে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী প্রসঙ্গে আলাপরত

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

২৩. বায়হাকী, *আস্-সুনানুল-কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৭৩২, হাদীস নং-১৫৫৬৬

২৪. দারাকুতনী, *আস্-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১১, হাদীস নং- ৩৮৪৮

ছিলেন। তাঁরা বললেন, উক্ত মহিলা চার বছর অপেক্ষা করবে। অতঃপর চার মাস দশ দিন ইদ্দতে ওফাত পালন করবে।[২৫]

প্রমাণ চার.

عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلاً انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ

ইয়াহইয়া ইবন জা'দা রহ.-এর সূত্রে ইবনু আবী শাইবা রহ. বর্ণনা করেন, আক্রান্ত মহিলাটি চার বছর অপেক্ষা করার পর 'উমর রা. তার স্বামীর অভিভাবককে তালাক প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং মহিলাকে চার মাস দশ দিন 'ইদ্দাতে ওফাত পালনের নির্দেশ দিলেন। এরপর যখন স্বামী ফেরত আসে, তখন তাকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে কিংবা মহর ফেরত নিতে ইখতিয়ার দিলেন।[২৬]

তৃতীয় মত : মেয়াদ নির্ধারণ বিষয়ে আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে

কতদিন বা কতবছর লাপাত্তা থাকার পর নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করা হবে- এ বিষয়ে আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। হানাফী মাযহাবের মতো ৬০/৭০/৮০/৯০ বছর কিংবা মালিকী মাযহাবের মতো ৪ বছর মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা যৌক্তিক হবে না। কারণ নিখোঁজ ব্যক্তিকে নব্বই বছর পর্যন্ত জীবিত গণ্য করে তার স্ত্রীকে ততদিন আবদ্ধ করে রাখা স্ত্রীর প্রতি স্পষ্টতই অবিচার ও তার অধিকার হরণ, বিশেষ করে যখন স্ত্রী ফিতনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ নিজেদের মাযহাবের সিদ্ধান্ত বর্জন করেছেন। অবশ্য সব ঘটনায় ৪ বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করাও অযৌক্তিক হবে। কারণ মৃত্যুর ব্যাপারে প্রবল ধারণা হওয়াই এখানে মুখ্য ও বিবেচ্য। অথচ তা সব ঘটনায় একই মেয়াদে অর্জন হয় না। কারণ বিমান দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া এবং মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া সমান ঘটনা নয়। তাই আদালত স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে যে ঘটনায় যে মেয়াদের পরে মৃত্যুর ব্যাপারে প্রবল ধারণা লাভ হবে ঐ মেয়াদের পরেই মৃত ঘোষণা করবে।

প্রমাণ এক. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

এবং তিনি (আল্লাহ) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।[২৭]

---

২৫. বায়হাকী, *আস্-সুনানুল-কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৭৩২, হাদীস নং-১৫৫৬৯

২৬. ইবনু আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৪, পৃ. ২৩৭

২৭. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

আয়াত থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ধর্মের মধ্যে কোনো ধরনের সংকীর্ণতা কিংবা কোনো সমস্যার যৌক্তিক সমাধান প্রদানে অপূর্ণতা রাখেন নি। আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাস্‌সির আবূ বকর আল-জাস্‌সাস (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ ضِيقٍ وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَيُحْتَجُّ بِهِ فِي كُلِّ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَوَادِثِ أَنَّ مَا أَدَّى إلَى الضِّيقِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ وَمَا أَوْجَبَ التَّوْسِعَةَ فَهُوَ أَوْلَى

ইবনু 'আব্বাস এবং মুজাহিদ রহ. 'حرج' এর অর্থ সংকীর্ণতা করেছেন। অতএব সকল বিতর্কিত বিষয়ে যে সব মত সংকীর্ণতা এবং অসহনীয় কষ্টের কারণ হবে তা বর্জন করে যে সব মত সহনীয় ও সহজ হবে তাই গ্রহণ করা শ্রেয়।[২৮]

ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুফাস্‌সির কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. (মৃ. ১২২৫ হি.) বলেন,

وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اى ضيق وتكليف يشتد القيام به عليكم، وقال مقاتل يعنى الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة في السفر والتيمم والإفطار في السفر والمرض واكل الميتة عند الضرورة والصلاة قاعدا او مستلقيا عند العجز وهو قول الكلبي

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এমন কঠিন কিছু চাপিয়ে দেননি, যা পালন করা তার জন্য অসহনীয় কষ্টদায়ক হবে। বিশিষ্ট তাবি'য়ী মুকাতিল রহ. এ আয়াতের অর্থ করেন, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ প্রয়োজনের সময় বান্দার জন্য 'رخصت' অর্থাৎ ছাড় -এর ব্যবস্থা রেখেছেন এবং এর অংশ হিসেবেই অপারগতার সময় শয়ন বা বসা অবস্থায় নামায পড়ার সুযোগ, সফর বা অসুস্থতার সময় রোযা ক্বাযা করার সুযোগ, সফরের সময় নামায দু' রাকাত পড়ার সুযোগ ইত্যাদি। এটি ইমাম কালবীরও মত। [২৯]

অতএব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এ মহা সত্য সকলের নিকট বোধগম্য হবে যে, একজন স্ত্রীকে স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর নব্বই বছর পর্যন্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখা তার প্রতি কতইনা রূঢ় ও নির্দয় আচরণ হবে! তাই তার জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

প্রমাণ দুই. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾

---

২৮. জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, (তাহকীক : আব্দুস্ সালাম) বৈরূত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ৩. পৃ. ৩২৭

২৯. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, পাকিস্তান : মাকতাবাতুর রশীদ, খ. ৬, পৃ. ৩৫৫

তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) বিবাহবন্ধনে রাখলে উত্তম উপায়ে রেখো, আর বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে চাইলে উত্তম উপায়ে মুক্ত করে দাও। আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না।[৩০]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যেখানে স্ত্রীদের কষ্ট হয় এমন পদ্ধতিতে আবদ্ধ করে রাখতে স্বামীদেরকে নিষেধ করেছেন, সেখানে স্বামী হারানো স্ত্রীকে নব্বই বছর পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা পবিত্র কুরআনের চাহিদার সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক।

প্রমাণ তিন. অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾

তুমি আগ্রহী হলেও কখনো সকল স্ত্রীর প্রতি- যদি একাধিক হয়- সমান ভালোবাসা পোষণ করতে সক্ষম হবে না। (কারণ তা অন্তরের বিষয় এবং অন্তরের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতেই)। তবে বাহ্যিক বিষয়ে একজনের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না, আর আরেকজনকে মু'আল্লাকা অর্থাৎ ঝুলন্ত অবস্থায় রেখোনা।[৩১]

ইবনু 'আব্বাস রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মু'আল্লাকা শব্দের অর্থ করেন, স্ত্রীকে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা, যাতে তার স্বামী আছে এমনও বলা যায় না, আবার সে স্বামীবিহীন এমনও বলা যায় না।[৩২]

তাই যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখতে স্বামীদেরকে নিষেধ করেছেন, সেখানে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য এভাবে নব্বই বছর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা স্পষ্টত কুরআনের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

প্রমাণ চার. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

যেসব স্বামী (কষ্ট দেয়ার নিমিত্ত চার মাসের অধিক সময়ের জন্য কিংবা স্থায়ীভাবে) স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার শপথ করবে, তাদেরকে (এ ব্যাপারে মনস্থির করার জন্য) চার মাসের সময় দেয়া হবে। (এ সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের শপথ থেকে) ফিরে আসে, (তা হলে জেনে রেখো) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও

৩০. আল-কুরআন, ২ : ২৩১

৩১. আল-কুরআন, ৪ : ১২৯

৩২. عن ابن عباس: "فتذروها كالمعلقة"، قال: تذروها لا هي أيم، ولا هي ذات زوج.
(*তাফসীরে তাবারী*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ২৯০)

দয়ালু। আর তারা যদি (এ সময়ের ভেতর) তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তা হলে (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তা'আলা সব শোনেন ও জানেন।[৩৩]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, চার মাসের ভেতরে শপথ ভেঙ্গে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে আল্লাহ তা'আলা শপথ ভঙ্গের দোষ ক্ষমা করবেন। তবে শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি চার মাস অতিক্রম হয়ে যায়, তা হলে হানাফী মাযহাব মতে তালাক কার্যকর হবে। আর শাফিয়ী মাযহাব মতে স্বামীকে তালাক প্রদানে বাধ্য করা হবে কিংবা আদালতের হস্তক্ষেপে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ছাড়াও স্ত্রীর যৌনাধিকারের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একজন স্বামী সর্বাধিক চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীকে যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে, এর বেশি নয়। অতএব দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে স্ত্রীর পরিত্রাণের এবং দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের একটি যৌক্তিক ব্যবস্থা থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।

প্রমাণ পাঁচ. ইসলামে নিজের বা অন্যের ক্ষতি করার সুযোগ নেই (لاضرر و لاضرار في الاسلام)

আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه

ইসলাম কাউকে ক্ষতি চাপিয়ে দেয় না, আবার অপরকেও ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না। যে কেউ অপরের ক্ষতি সাধন করবে আল্লাহ তার ক্ষতি সাধন করবেন আর যে কেউ অপরের জন্য সংকট সৃষ্টি করবে আল্লাহ তাকে সংকটে নিপতিত করবেন।[৩৪]

আলোচ্য বিষয়ে 'নিখোঁজ' ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টত সে স্ত্রীর ক্ষতি করেছে। আর যদি নিখোঁজ হওয়াতে তার কোনো এখতিয়ার না থাকে তাহলে সে স্ত্রীর কোনো ক্ষতি করেনি বটে; তবে সে স্ত্রীর ক্ষতির কারণ হয়েছে।

আরেকটি হাদীসে আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا

---

৩৩. আল-কুরআন, ২ : ২২৭

৩৪. ইমাম দারাকুতনী, *আস্- সুনান,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ', বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৮৬হি./১৯৬৬ খ্রী., খ. ৩, পৃ. ৪৭
ইমাম আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তাবরানী রাহ. প্রমূখ মুহাদ্দিছগণ হাদীসটি ইব্ন 'আব্বাস রা.- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাকী 'উবাদাহ ইব্নুস সামিত রা.- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক,* বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি., হাদীস নং ২৩৪৫

দীন খুবই সহজ। কেউ দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে জয়ী হতে পারবে না। বরং দীন তার উপরই বিজয় লাভ করবে। (অর্থাৎ চরম পন্থা অবলম্বন করে কেউ স্থির থাকতে পারবে না। বরং একপর্যায়ে দুর্বল হয়ে সহজ পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়বে।) তাই তোমরা কঠোর পন্থা পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।[৩৫]

বস্তুত আলোচ্য বিষয়ে নব্বই বছর অপেক্ষা করার মতো কঠিন পথ অবলম্বন না করে বিষয়টি আদালতের হাতে ন্যস্ত করাই অধিক শ্রেয় হবে।

প্রমাণ ছয়. ক্ষতি সর্বদা অপসারণযোগ্য (الضرر يزال)

উসূলে ফিক্‌হের একটি মূলনীতি হলো (الضرر يزال) ক্ষতি সর্বদা অপসারণযোগ্য। যখন দেখা যাবে কেউ কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাহলে এমন একটি পন্থা উদ্‌ঘাটন করতে হবে, যাতে উক্ত ব্যক্তি ক্ষতি থেকে মুক্তি পায়। 'আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (মৃ. ৭৭১ হি.), 'আলা উদ্দীন হাম্বালী (মৃ. ৮৮৫ হি.), জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.), ইবনু নুজাইম আল মিসরী (মৃ. ৯৭০ হি.)সহ প্রায় সকল উসূলবিদ এটিকে ফিকহের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'আলাউদ্দিন হাম্বালী এ মূলনীতিকে ফিক্‌হের প্রায় অর্ধেক মাসআলার ভিত্তি বলেছেন। অতএব, এ মূলনীতির আলোকে স্বামী হারানো মহিলার জন্য এমন কোনো উপায় থাকা দরকার, যাতে করে সে স্বামী হারিয়ে সংসার জীবনে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়।

হানাফী মাযহাবের পেশকৃত দলীলসমূহের পর্যালোচনা

মুগীরা রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। ইবনু হাজার 'আসকালানী রহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) তার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে হাদীসটির সনদ দুর্বল (ضعيف) আখ্যায়িত করেছেন।[৩৬] ইমাম বায়হাকী তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে সনদে সিওয়ার (سوار) নামক বর্ণনাকারী (راوي) কে দুর্বল (ضعيف) বলেছেন।[৩৭] ইবনু আবী হাতিম (মৃ. ৩২৭ হি.) তাঁর 'علل الحديث' গ্রন্থে বলেন, আমি আমার পিতাকে সিওয়ার সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি উত্তরে বললেন,

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عَنْ الْمُغِيرَةِ احاديث مَنَاكِيرَ أَبَاطِيلَ

হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য। সনদে বিদ্যমান বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন শুরাহবীল এমন ব্যক্তি, যার বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। তিনি মুগীরার সূত্রে বিভিন্ন বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন।[৩৮]

---

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, (তাহকীক : মুস্তফা বেগ আলবগা) অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : আদ-দীনু ইউসরুন, বৈরূত : দারু ইবনু কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৩

৩৬. ইবনু হাজার 'আসকলানী, *বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম*, খ. ১, পৃ. ৪৪১

৩৭. বায়হাকী, *আস্-সুনান*, খ.৭, পৃ. ৪৪৫

৩৮. ইবনু আবি হাতিম, *ইলালুল হাদীস*, খ. ৪, পৃ. ১১৮

'আল্লাম যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৬২ হি.) ইবনু আবি হাতিমের উক্তিটি বর্ণনা পূর্বক বলেন, বিশিষ্ট সনদবিশারদ 'আব্দুল হক ইশবিলী (মৃ. ৫৮১ হি.) তার 'আহকাম' গ্রন্থে এবং ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী (মৃ. ৬২৮ হি.) সিওয়ার এবং মুহাম্মদ বিন শুরাহবীলকে প্রসিদ্ধ 'متروك الحديث' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৯] উল্লেখ্য যে, দুর্বল হাদীস কোনো বিধান প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রথমত হাকাম বিন 'উতাইবা সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও দুর্বল। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আবুল ওয়ালীদ আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৭৪ হি.) বলেন, হাদীসের অধিকাংশ সনদ পরম্পরাবিহীন এবং যে সব সনদে পরম্পরা রয়েছে তাও দুর্বল। অধিকন্তু হাদীসটিতে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে।[৪০] দ্বিতীয়ত, উক্ত হাদীসে মৃত্যুর সংবাদ আসা থেকে উদ্দেশ্য হলো এমন কোনো সংবাদ আসা যাতে মৃত্যুর ব্যাপারে প্রবল ধারণা লাভ হয়। কারণ ফিকহী বিধানে প্রবল ধারণা হওয়া নিশ্চিত হওয়ার সমতুল্য। তৃতীয়ত, হাদীসটি 'আলী রা. এর উক্তি। অথচ 'উমর রা.সহ অসংখ্য সাহাবা কিরাম এর বিপরীত উক্তি করেছেন। অতএব "اذا تعارضا تساقطا" সমপর্যায়ের দু'টি দলীল যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখন উভয়টি দলীল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

অন্য দিকে হানাফী ফকীহগণ (اليقين لا يزال بالشك) দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন- এ ব্যাপার কথা হলো, এটা সত্য যে, নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয় কেবল সন্দেহের কারণে রহিত হয় না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নিশ্চিত বিষয়কে রহিত করার জন্য আরেকটি নিশ্চিত বিষয়ের প্রয়োজন হবে। বরং নিশ্চিত বিষয় রহিত হওয়ার জন্য এর বিপরীত বিষয়ের প্রবল ধারণা হওয়াই যথেষ্ট। যেমন কোনো ব্যক্তির অযু ছিল। পরবর্তীতে অযু ভঙ্গ হওয়ার প্রবল ধারণা হলো, তাহলে তাকে পুনরায় অযু করতে হবে। বিশিষ্ট উসূলবিদ ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

> مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لا يَرْتَفِعُ إلا بِيَقِينٍ وَالْمُرَادُ به غَالِبُ الظَّنِّ
> একটি ইয়াকীন কেবল আরেকটি ইয়াকীন দ্বারা রহিত হয়। এই মূলনীতিতে দ্বিতীয় ইয়াকীন থেকে উদ্দেশ্য হলো প্রবল ধারণা।[৪১]

'আলাউদ্দিন আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন,

> أَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ حُجَّةٌ مُوجِبَةٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَأَنَّهُ فِي الأَحْكَامِ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ

---

৩৯. যায়লা'ঈ, *নাসবুর রায়া*, মুআস্‌সাসাতুর রিয়ান, ১৯৯৭ খ্রি, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩

৪০. وَهِيَ أَسَانِيدُ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ وَمَا اتَّصَلَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ
(আবুল ওয়ালীদ আল-কুরতুবী, *আল-মুনতাকা,* মিসর : মাতবায়ুস সা'আদা, ১৩৩২ হি., খ. ৪, পৃ. ৯১)

৪১. ইবনু নুজাইম আল-মিসরী, *আল-আশবাহ ওয়ান্ নাযায়ের,* বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫১

কোনো কর্ম ওয়াজিব হওয়ার জন্য 'প্রবল ধারণা' উপযুক্ত প্রমাণ। অধিকন্তু বিধান বিষয়ে তা ইয়াকীনের সমপর্যায়ের।[৪২]

ড. মুহাম্মদ সিদকী বলেন,

فإن ترجح أحدهما و لم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين

ইতিবাচক এবং নেতিবাচক এর মধ্য যে দিকটি প্রবল হবে, তাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় 'ظن' বলা হয়। তবে তাতে অপর দিকটিরও সম্ভাবনা থাকে। আর যদি অপর দিকটির সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়, তখন তাকে 'غالب الظن' বলে এবং তা ইয়াকীনের সমপর্যায়ে।[৪৩]

অতএব, আলোচ্য বিষয়ে বিচারক নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত করতে না পারলেও যদি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে মৃত্যুর বিষয়ে তার প্রবল ধারণা লাভ হয়, তাহলে সে নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করতে কোনো বাধা নেই। এর সপক্ষে আরেকটি দলীল হলো- হানাফী মাযহাবে সমবয়সী সকল লোকের মৃত্যুকে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যুর মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ এ ক্ষেত্রেও তার মৃত্যুর বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। কারণ হতে পারে, সকল সমবয়সী লোকের মৃত্যুর পরও সে জীবিত রয়ে গেছে। তবে জীবিত থাকার তুলনায় মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই প্রবল। অতএব, এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়েছে, ইয়াকীনের উপর ভিত্তি করে নয়।

দ্বিতীয় মতের সপক্ষে পেশকৃত দলীলসমূহের পর্যালোচনা

এক. শরী'অতের কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ বা সংখ্যা নির্ধারণ করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য সংরক্ষিত। কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো বিষয়ে স্থায়ী মেয়াদ বা সংখ্যা নির্ধারণ করার অধিকার নেই।[৪৪]

দুই. কোনো কোনো ফিক্হবিদ 'উমর রা. এর মতের সপক্ষে অর্থাৎ চার বছর মেয়াদ নির্ধারণ করাকে কিয়াসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, 'উমর রা. ইলা (স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার শপথ করা) এবং 'ইন্নীন (যৌনকর্মে অক্ষম ব্যক্তি) এর ওপর একসাথে কিয়াস করেছেন। ইলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা চার মাস

---

৪২. আল-কাসানী, *বাদায়ি'উস্ সনায়ি'*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬

৪৩. ড. মুহাম্মদ সিদকী, *আল ওয়াযীয ফী ইযাহে কাওয়ায়িদিল ফিকহ*, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, খ. ১. পৃ. ১৬৮

৪৪. وإن تقدير الأعداد كما يقرر الفقهاء أمر توقيفي خالص لا يجرى فيه القياس

(সায়্যিদ তানতাভী, *আত তাফসীরুল ওয়াসীত*, খ. ১, পৃ. ৫৩৫)

অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৫] এর থেকে তিনি চার সংখ্যাটি নিয়েছেন। আর ইন্নীন এর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. একবছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬] তা থেকে তিনি বছরটি নিয়েছেন। এভাবে চার এবং বছর একসাথে যুক্ত করে উক্ত মেয়াদকে চার বছর সাব্যস্ত করেছেন। তাদের পেশকৃত এ যুক্তিটি খুবই দুর্বল ও অবাস্তব। ইলা ও 'ইন্নীন এর সাথে নিখোঁজ-এর বিষয়টি তুলনা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইলার (ايلاء) ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকে, অথচ নিখোঁজ এর ব্যতিক্রম। আর 'ইন্নীনের (عنين) ক্ষেত্রে একবছর অপেক্ষার নির্দেশ একারণে যে, একজন লোক যৌনশক্তি ফিরে পেতে এক বছর পর্যাপ্ত সময়। এক বছরেও সুস্থ না হলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই এক বছর পর আদালত বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। অথচ নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে আসার ক্ষেত্রে এরকম কোনো ধরাবাঁধা নিয়মনীতি নেই।[৪৭] বরং এককে ঘটনার ধরন এককে রকম।

তিন. উমর রা. এর সিদ্ধান্ত কোনো মূলনীতি হিসেবে ছিল না। কারণ কোনো সাধারণ কিয়াসের আলোকে তিনি এ মেয়াদ নির্ধারণ করেন নি। বরং এ কিয়াস ছিল বিশেষ ঘটনার জন্য বিশেষ কিয়াস। এ সংক্রান্ত যেসব হাদীস পাওয়া যায় প্রায় সবকটি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এমনটি নয় যে, তৎকালে এ জাতীয় অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং 'উমর রা. সব ঘটনায় একই মেয়াদের কথা বলেছেন। এমনটি হলে নির্দ্বিধায় বলা যেতো যে, 'উমর রা. তাঁর নিকট উদ্ভাসিত কোনো যুক্তি বা কিয়াসের আলোকে তিনি এ মেয়াদ স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করেছেন। বরং বাস্তবতা এর বিপরীত। ঐ সময় এ জাতীয় একটি মাত্র ঘটনারই বিবরণ পাওয়া যায়। 'উমর রা. বিশেষ ইজতিহাদের আলোকে ঐ ঘটনার জন্য বিশেষ ফায়সালা দিয়েছিলেন, স্থায়ী ফায়সালা নয়। ঐ ঘটনায় তিনি প্রবল আশাবাদী ছিলেন যে, চার বছর পর অবশ্যই কোনো না কোনো সংবাদ আসবেই। তাই তিনি চার বছরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এর যুক্তি হিসেবে বলেছেন, যেহেতু দিক চারটি তাই অবগতি লাভ করার জন্য উমর রা. ঐ ঘটনায় একেকটি দিকের জন্য একেকটি বছর নির্ধারণ করেছিলেন। অথচ লক্ষণীয় যে, কোনো বিষয়ে খবরাখবর ও অবগতি লাভের ক্ষেত্রে তখনকার সময় এবং বর্তমানের যান্ত্রিক সময়ের মধ্য বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ফিক্হবোর্ডের মতামত

নিম্নে এ মতের সপক্ষে প্রসিদ্ধ ফিক্হবিদ ও ফিক্হবোর্ডের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরা হলো। এতে করে বিষয়টি আরো পরিষ্কার ও সংশয়মুক্ত হবে।

---

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ৩৬ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

৪৬. عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً»
('আব্দুর রায্যাক, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫৩)

৪৭. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকায়িক*, কায়রো : আল-মাত্বাআতুল-কুবরা, ১৩১৩ হি., খ. ৩, পৃ. ৩১১

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু নুজাইম আল-মিসরী রহ. বলেন,

وَفَوَّضَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى الْقَاضِي فَأَيُّ وَقْتٍ رَأَى الْمَصْلَحَةَ حَكَمَ بِمَوْتِهِ، قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ

কোনো কোনো ফকীহ মৃত ঘোষণা প্রসঙ্গে মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি বিচারক বা আদালতের নিকট ন্যস্ত করেছেন। আদালত যে ঘটনায় যে মেয়াদ উপযুক্ত মনে করবে ঐ মেয়াদের পরেই মৃত ঘোষণা করবে। ব্যাখ্যাকারী অর্থাৎ ইবনু নুজাইমের নিকট এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।[৪৮]

'আল্লামা ফখরুদ্দিন আয-যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৪৩ হি.) বলেন,

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الإِمَامِ لأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الْبِلادِ وَكَذَا غَلَبَةُ الظَّنِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَشْخَاصِ ...

এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত হলো, বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের অভিমতের ওপর ছেড়ে দেয়া। কেননা প্রবল ধারণা লাভের মেয়াদটি দেশ এবং ব্যক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।[৪৯]

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত হাম্বালী ফকীহ ইবনু 'উছাইমীন বলেন,

ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، ... وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء

সাহাবা কিরাম থেকে (চার বছরের) যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে তা বিশেষ ঘটনার জন্য বিশেষ মত এবং যে কোনো বিশেষ ঘটনা ইজতিহাদনির্ভর। অতএব, এক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হবে সকল ঘটনার জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ না করে মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধান বা আদালতের উপর ন্যস্ত করা।[৫০]

নিজামুদ্দিন আল-বালাখী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে,

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الإِمَامِ

সর্বোত্তম উপায় হলো বিষয়টি আদালতের রায়ের উপর ন্যস্ত করা।[৫১]

শায়খ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ফাতওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে,

والذي يرجحه المحققون من العلماء أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال ، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها ، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة

---

৪৮. ইবনু নুজাইম আল-মিসরী, *আল-বাহরুর রায়িক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭৮

৪৯. ফাখরুদ্দিন আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকায়িক*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১১

৫০. ইবনু উছাইমীন, *আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুসতাকনি'*, খ. ১১, পৃ. ২৯৭

৫১. *আল-ফাতাওয়া হিন্দিয়া*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৩১০ হি., খ. ২, পৃ. ৩০০

গবেষক উলামায়ে কিরাম আলোচ্য বিষয়ে মেয়াদের বিষয়টি বিচারকের নিকট ন্যস্ত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তা কাল-পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে পৃথক হবে। অতএব, বিচারক নিজ ইজতিহাদের আলোকে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করবে এবং তদ্‌পরবর্তীতে মৃত ঘোষণা করবে।[৫২]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্‌হবিদ ইবনু 'আবিদীন (মৃ. ১২৫২ হি.) বলেন, এ মতটি হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের (ظاهر الرواية) খুব কাছাকাছি। কারণ, উভয় মতে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ পরিহার করা হয়েছে। আর যেহেতু নিখোঁজের ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপ একান্তই প্রয়োজন, তাই মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টিও আদালতের নিকট ন্যস্ত করা উচিত হবে। আদালত যে ঘটনায় যে মেয়াদ উচিত মনে করবে ঐ মেয়াদের পরে মৃত ঘোষণা করবে। কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করা উচিত হবে না। কারণ, শরীয়ত এ বিষয়ে কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করে নি।[৫৩] টীকায় এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য উৎসসহ উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪]

---

৫২. মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, *ফাতওয়াল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৫১০৯

৫৩.

قلت والظاهر أن هذا (أي التفويض الي الحاكم) غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن

ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه فلا يقول بالتقدير لأنه لم يرد الشرع بل ينظر في الأقران وفي الزمان والمكان ويجتهد

(ইবনু 'আবিদীন, *হাশিয়াতু রদ্দিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০০ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ২৯৭)

৫৪.

وقيل يفوض إلى رأي الإمام لأنه يختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل مهلكة (مجمع الانهر، ج٢، ص٥٤١)

يجتهد في ذلك الحاكم والإمام فيما يغلب على ظنه مما يؤديه إليه الفحص عن أخباره فإذا غلب عليه أنه هلك اذن لامرأته في النكاح بعد أن تعتد ويقسم ماله (الكافي في فقه اهل المدينة،ج٢،ص٥٦٩)

وقد اختار الزيلعي ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأى الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد والأشخاص، فيجتهد، ويحكم بالقرائن الظاهر الدالة على موته أو حياته (فتاوى دار الافتاء المصرية،ج٢،ص٤١٨)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي ، فَأَيُّ وَقْتٍ رَأَى الْمَصْلَحَةَ حَكَمَ بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ لِلْوَفَاةِ كَأَنَّهُ مَاتَ فِيهِ مُعَايَنَةً ، إذْ الْحُكْمِيُّ مُعْتَبَرٌ بِالْحَقِيقِيِّ(فتح القدير، ج١٣، ص٤٣٨)

والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى احتهاد القاضي في كل عصر.(فقه السنة ،ج٣،ص٦٥٢)

উপসংহার

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নব্বই বছর অপেক্ষা করা খুবই দুঃসহনীয়। এ কারণে পরবর্তী ফকীহগণ তা বর্জন করেছেন। আর মালিকী মাযহাবানুযায়ী সকল ঘটনায় চার বছর মেয়াদ ধার্য করা অহী নির্ভর কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। অতএব, বিষয়টি আদালতের নিকট ন্যস্ত করাই যৌক্তিক হবে। তবে এ ক্ষেত্রে আদালতকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। আদালত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও তদন্ত সাপেক্ষে মৃত্যুর প্রবল ধারণা অর্জন হলেই মৃত ঘোষণা করবে। বস্তুতঃ কোনো একটি বিষয়ে স্বামী মৃত ঘোষিত হলে, মীরাছ বণ্টনসহ অন্য সব বিষয়েও সে মৃত গণ্য হবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার

ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান*

*[**সারসংক্ষেপ :** বর্তমান পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। 'সামাজিক ন্যায়বিচার'-এর মূল লক্ষ্য হলো প্রত্যেককে তার হক বা প্রাপ্য অংশ পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া। এ ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, আরব-অনারব, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু, দল-মত নির্বিশেষে কেউ কোন রকম অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হবে না। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলগণের প্রধান কাজ ছিল আল্লাহর বিধানের আলোকে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ স. সামাজিক ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সমাজের সকলের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যাবলির মাধ্যমে তিনি এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর জন্য তিনি শরীয়তের বিধান যেমন কার্যকর করেন, তেমনি সকলকে আখিরাতমুখী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেন। আখিরাতের কঠিন জবাবদিহিতার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করেন। এভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এমন এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আধুনিক বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে লক্ষ্য করতে হবে এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে মানবরচিত মতবাদের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব না। এ সব বিষয়ে আলোচনাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।]*

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, চারিদিকে অশান্তি ও নৈরাজ্যকর পরিবেশ বিরাজমান। এ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ মানুষের সার্বিক জীবন ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের অভাব। মুসলিম বিশ্ব এবং তথাকথিত প্রগতিশীল পাশ্চাত্য সমাজ কেউই এ অশান্তি থেকে মুক্ত নয়। বিশ্ব-মুসলিম আজ একদিকে যেমন দ্বীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত, অন্যদিকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আচার-আচরণ, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির মোকাবেলা করাসহ দুনিয়াবী বহুক্ষেত্রে তারা ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করতে ব্যর্থ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়েছে। যার ফলে তারা আজ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত, নির্যাতিত ও অপদস্থ। অপরদিকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্য সমাজের সকল প্রচেষ্টাও তেমন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারছে না। এর প্রধান কারণ, মানুষের সার্বিক জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার উপযোগী মূল্যবোধ তাদের কাছে নেই। এ কারণে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি বস্তুবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও এর সমাধান করতে পারেনি। আসলে মানুষের সার্বিক জীবনের সঠিক নির্দেশনা কেবল ইসলামের মধ্যেই বিদ্যমান। কারণ ইসলামের নিয়মনীতি ও বিধিবিধান একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমগ্র মানব সমাজের সম্পর্ক- প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা খুবই স্পষ্ট। এসব নির্দেশনাবলির ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বাস্তবায়নই কেবল সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। যার বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স. কিভাবে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আজও আধুনিক বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সামাজিক ন্যায়বিচার কিভাবে ও কতটা ভূমিকা রাখতে পারে সেটিই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়।

'সামাজিক ন্যায়বিচার'-এর পরিচয়

'সামাজিক ন্যায়বিচার' ধারণাটি ব্যাপক অর্থবোধক। এটি দ্বারা শুধু সমাজের কোন একটি বিশেষ দিকের ন্যায়বিচার বুঝায় না, বরং সমাজের সার্বিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান লক্ষ্য। যদিও কেউ কেউ 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বলতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করাকে বুঝিয়েছেন।[১] কিন্তু ব্যাপক অর্থে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বলতে সমাজের কল্যাণের জন্য সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ন্যায়-আচরণকে বুঝায়। John Rawls উল্লেখ করেছেন, সামাজিক ন্যায়বিচার একটি দার্শনিক মতবাদ। বিশ্বের প্রতিটি সমাজে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে মানুষের অধিকার প্রদান ও এক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই 'সামাজিক ন্যায়চিার'-এর উদ্দেশ্য।[২] কেউ কেউ সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেন-

- সমানাধিকার, বৈষম্যহীনতা এবং সুযোগের সমতা বিধান;
- সম্পদের ন্যায়ানুগ বণ্টন;

---

১. ফুওয়াদ আদিল, *আল-'আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাহ,* মিশর : দারুল কাতিব লিত তিবা'য়াহ ওয়ান নাশর, ১৯৬৯, পৃ. ১১

২. John Rawls, *A Theory of Justice,* Sharja : Bentham, 1971, p. 23

- সামাজিক নিরাপত্তা;
- সাধারণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা এবং
- জাতি, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।[৩]

এক কথায় 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বলতে সমাজের এমন অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, গোত্র, জাতি, রাষ্ট্র ও বর্ণভেদে প্রত্যেক মানুষ তার পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুযায়ী তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে সে কোন ধরনের জুলুমের শীকার হবে না।

এটি 'সামাজিক ন্যায়বিচার' ধারণার সামগ্রিক রূপ। আর ইসলামে এটিকে আরো ব্যাপক পরিসরে ব্যাখ্যা করা হয়। এর মধ্যে তাওহীদ, সৃষ্টিজগৎ এবং মানুষের সার্বিক জীবন সম্পৃক্ত। কারণ ইসলাম একটি অবিভাজ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। এর প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষ, ব্যক্তি, সমষ্টি, রাষ্ট্র- সব কিছুই সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র সৃষ্টিজগৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন। সৃষ্টিজগৎ সুন্দররূপে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেকটি বস্তুর একটি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

আমি সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।[৪]

আর আল্লাহর এই সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস একটির সাথে আরেকটি নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যখন পরস্পরের এই সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন সৃষ্টি জগতেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সকলের পারস্পরিক সম্পর্কে যখন ন্যায়বিচারের ঘাটতি হয় তখন সৃষ্টিজগৎ অশান্তি ও নৈরাজ্যে ভরে যায়। এজন্য ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেককে তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া এবং এর মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচার-এর গুরুত্ব

আগেই বলা হয়েছে, ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যই হলো প্রত্যেককে তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া। সমাজের প্রত্যেকে যদি তার প্রাপ্য অংশ পায়, তবে সেখানে কোন রকম ঝগড়া-ফাসাদ, অশান্তি ও হানাহানি থাকে না। এ কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তিময় সমাজ ছিল নবী-রাসূলগণ কর্তৃক

---

৩. আহমাদ আস-সাইয়্যেদ আন-নাজ্জার, *আল-আলিইয়াতুল ইকাতছাদিয়্যাহ লি বিনাইল আদালাহ আল-ইজতিমা'ইয়্যাহ,* কায়রো : মারকাজুদ দিরাসাত, ২০১২, পৃ. ১১৯

৪. আল-কুরআন, ৫৪ : ৪৯

প্রতিষ্ঠিত সমাজ। আর তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রধান ভিত্তিই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এটা তাঁদের দায়িত্বও ছিল। আর এ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনের বহু স্থানে নবী ও রাসূলগণকে সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের ওপর কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানবজাতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আমি লোহাও নাযিল করেছি, যার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের অনেক কল্যাণ আছে; এ জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।[৫]

'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সৎকাজ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও অবাধ্যতা নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৬]

এছাড়া যারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না তাদেরকে আল-কুরআন কাফির[৭], যালিম[৮] ও ফাসিক[৯] হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে-

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষীরূপে তোমরা অবিচল থেকো। কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করবে। এটা তাক্বওয়ার অধিকতর কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ নিশ্চয়ই তার খবর রাখেন।[১০]

---

৫. আল-কুরআন, ৫৭ : ২৫
৬. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০
৭. আল-কুরআন, ৫ : ৪৪
৮. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫
৯. আল-কুরআন, ৫ : ৪৭
১০. আল-কুরআন, ৫ : ৮

এ আয়াতের তাফসীরে 'আল্লামা হাফিয ইবন কাছীর রহ. বলেন,

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوَّامين بالقسط؛ أي: بالعدل، فلا يَعدلوا عنه يمينًا ولا شمالاً، ولا تأخذهم في الله لومةُ لائم، ولا يَصرفهم عنه صارفٌ، وأن يكونوا متعاونين مُتساعدين مُتعاضدين، مُتناصرين فيه

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের ন্যায়ের সাক্ষীরূপে অবিচল থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তারা ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হয়ে ডানে বা বামে যেতে পারবে না। তাদেরকে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দা প্রভাবিত করবে না, কোন বাধাদানকারী বিরত রাখতে পারবে না। আর তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।[১১]

যে বান্দা তার স্রষ্টার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, মানুষিক প্রশান্তিতে জীবন কাটানো তার জন্য অনেক সহজ হয়। পরিবারের প্রত্যেকে যদি অন্যের হক ঠিকমত আদায় করে, তাহলে সে পরিবার সুখ ও শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকে যদি অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে, কেউ কাউকে যদি বঞ্চিত ও জুল্‌ম না করে, তাহলে সেই সমাজ ও রাষ্ট্র শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর এর বিপরীত হলে সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

মানুষের স্বহস্ত উপার্জনের দরুন জল-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো হবে, যাতে তারা বিরত হয়।[১২]

এ জন্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত পৃথিবী পরিচালনা করেন। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তিনি সকল কিছুর সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি বলেন-

﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ﴾

তিনি সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করেন আর তাঁর আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেন।[১৩]

সুতরাং তাঁরই নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী পৃথিবী চললে সেখানে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এছাড়া মানব রচিত কোন পন্থায়, অন্যের উপর জুল্‌ম করে, জোর করে অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব নয়।

---

১১. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ : দারু তাইবাহ্ লিন নাশর ওয়াত তাওযী', ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯, খ. ২, পৃ. ৪৩৩

১২. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

১৩. আল-কুরআন, ১৩ : ২

বর্তমান বিশ্বে শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার পরিস্থিতির স্বরূপ

আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে তাকালে আমরা যে চিত্র দেখতে পাই তা সত্যিই হতাশাজনক। বিশ্ব শান্তি আজ হুমকির মুখে। সামাজিক ন্যায়বিচার এখানে সুদূর পরাহত। জাহেলী যুগের মত 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিই যেন সারা বিশ্বে বিরাজমান। ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, আন্তর্জাতিক অঙ্গন-সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের অনেক অভাব। অনেক মারাত্মক অপরাধী ক্ষমতার বলে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আবার দুর্বল হওয়ার কারণে লঘু অপরাধে অনেকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করছে। এমনকি অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তিকেও দেয়া হচ্ছে মারাত্মক শাস্তি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করছে। তাদের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য করছে। সহজে তা মেনে না নিলে শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি কখনো কখনো অন্যায়ভাবে তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। মিথ্যা অজুহাতে গোটা দেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মুসলিমদের ও মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা আরো ভয়ানক। সারা পৃথিবীতে আজ তারা নানা জুলুম-নির্যাতনের স্বীকার। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় তারা জর্জরিত। ইসলাম বিদ্বেষী সম্প্রদায় মুসলিম ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর নানামুখী নির্যাতন চালাচ্ছে। কোথাও তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে, কোথাও আবার পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে। কোথাও আবার প্ররোচনা দিয়ে মুসলিমদের বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করছে। এর মধ্যে কোন এক দলকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে অন্য দলের ওপর লেলিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ও এক্ষেত্রে কম দোষী নয়। তারা আজ ইসলামের শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। সঠিক ইসলাম থেকে তারা বিচ্যুত। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত। আল-কুরআনের এই শিক্ষা তারা নিজেদের সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারছে না। আল্লাহ্ বলেছেন-

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

যদি মুমিনদের দুটি দল মারামারি করে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর যদি তাদের এক দল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়বে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে তোমরা উভয়ের মাঝে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ তো সুবিচারকারীদেরকেই ভালোবাসেন।[১৪]

---

১৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ৯

এ কারণে বর্তমান বিশ্বে দেখা যায়, বেশিরভাগ অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হচ্ছে হয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর, না হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শাসিত এলাকায়। আমরা যদি মিয়ানমারের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের নামে গত পঞ্চাশ বছর ধরে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন পরিচালনা করছে। মুসলিমদের ব্যাপারে তারা যেন গৌতম বুদ্ধের বাণী 'প্রাণী হত্যা মহা পাপ' এবং 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' ভুলে গেছে। তারা সেখানে মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধসহ সকল মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করছে। ধ্বংস করছে তাদের ঘর-বাড়ি।[১৫] অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ দখল করে নিচ্ছে। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে তেমন কিছু যেন অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতা থাকলে সবকিছু করা বৈধ মনে করা হচ্ছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্ব-নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীসমূহ সেখানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। জোর করে সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উৎখাত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণা[১৬] অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী ইঙ্গ-মার্কিন জোট সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অসহায় ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজিত হওয়ার পর ফিলিস্তিনিদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ইসরাইল কর্তৃক একের পর এক ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড জোরপূর্বক দখলের মাধ্যমে বহু ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এরপর প্রায় সাত দশক পেরিয়ে গেলেও উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরা আজো তাদের নিজ আবাসে ফিরতে পারেনি। বরং ইসরাইলের নির্যাতনে প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ, শিশু নিহত হচ্ছে। নির্বিচারে বর্ষিত বোমার আঘাতে তাদের ঘর-বাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। ইসরাইলী দখলদার বাহিনী নানা অজুহাতে ফিলিস্তিনিদের তাদের আবাস থেকে উচ্ছেদ করছে। তাদের জায়গা-জমি দখল করছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বহু পশ্চিমা দেশ নীরবে তাদের এসব অন্যায় কর্মকাণ্ডের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার মিথ্যা অজুহাতে ইরাককে ধ্বংস করা হয়েছে। সেখানে নির্বিচারে হাজার হাজার নিরীহ ও নিরপরাধ নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। আফগানিস্তানও একই পরিণতি ভোগ করেছে। একজন ব্যক্তিকে শাস্তি

---

১৫. মাহমুদুর রহমান, *মুসলমানের মানবাধিকার থাকতে নেই*, ঢাকা : কাশবন প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ১৪০

১৬. ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেম্স্ বেলফোর তাঁর দেশের ইহুদী নেতা ব্যারন রথচাইল্ডকে লিখিত এক পত্রের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের আরব ভূমিতে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। যাকে ঐতিহাসিক বেলফোর ঘোষণা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

দিতে গিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে বহু জনপদ। বন্দী করা হয়েছে বহু মানুষকে। শুধু বন্দী করেই ক্ষান্ত দেয়া হয়নি। বন্দীদের উপর চালানো হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। গুয়াতানামো কারাগারের কথা আমরা জানি। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগার, যা বন্দীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত। এই কারাগারে বন্দীদের বিনাবিচারে আটক রাখা হয় এবং তথ্য আদায়ের লক্ষ্যে ওয়াটার বোর্ডিংসহ বিবিধ আইন বহির্ভূত উপায়ে নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের প্রকার ও মাত্রা এতই বেশি যে এই কারাগারকে মর্ত্যের নরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৭]

ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও লিবিয়ার ন্যায় সিরিয়া, মিসর ও ইয়ামেনেও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। অন্যায়-অত্যাচার ও জুল্‌ম-নির্যাতনে সেখানের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। সেখানে অমুসলিমদের চেয়ে মুসলিমদের দ্বারাই অন্য মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর মুসলিমরা এ সব বন্ধে সেখানে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। তারা পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলো দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলিম নামধারী কিছু অত্যাচারী শাসক দ্বারা তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করছে অমুসলিমরা।

এছাড়া বর্তমানে সারা বিশ্বের অমুসলিম সমাজেও চরম অশান্তি বিরাজমান। বর্তমানের পরিবর্তিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের বানানো বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ মানুষের সামগ্রিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাওহীদ ও আখিরাত বিমুখ কোন জড়বাদী নীতি কখনো সমাজে সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ইনসাফপূর্ণ কোন কর্মসূচী নেই। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবন আজ হুমকির মুখে। সেখানে পিতা তার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে না। একইভাবে সন্তানও পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করছে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের হক আদায় করছে না। ফলে সেখানে এক অশান্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছে।[১৮] এছাড়া পাশ্চাত্যের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নানাভাবে বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর তাদের অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। যে কারণে বিশ্বশান্তি চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ স.-এর 'সামাজিক ন্যায়বিচার' ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব

রাসূলুল্লাহ স.-এর রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সকল স্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে প্রত্যেককে তার পরিপূর্ণ হক

---

১৭. http://archive.prothom-alo.com/detail/news/27087

১৮. সায়্যিদ কুতুব, *আল-'আদালাহ আল-ইজতিমা'ইয়্যাহ ফিল ইসলাম,* বৈরুত : দারুশ শুরুক, ১৯৯৫, পৃ. ২৭

দিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ স.-কে অধিক গুরুত্বসহকারে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে-

﴿ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

অতএব তুমি লোকদেরকে (সেই বিধানের দিকে) ডাকো এবং নিজে অটল থাকো, যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো। তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না। বলো, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তা বিশ্বাস করেছি। আর আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের এবং তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।[১৯]

আল-কুরআনের আবেদন অনুসারে তিনি সকলকে এমন এক সমাজ ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করেন যেটা পরিপূর্ণ ইনসাফভিত্তিক। এ জন্য তিনি সর্বপ্রথম নিজেকে সমস্ত ভাল গুণে গুণান্বিত করেন। ন্যায়বিচার, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, ওয়াদা রক্ষা, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি উত্তম মানবিক গুণাবলি ছোটকাল থেকেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে তৎকালীন আরব সমাজের নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা তাঁকে ব্যথিত করত। সে সময় গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। তাদের মধ্যে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য বিদ্যমান ছিল না। সবলরা দুর্বলের ওপর জুল্‌ম-নির্যাতন চালাতো। সুদের যাঁতাকলে পিষ্ট হতো গরীবরা। আর ধনীরা অর্থনৈতিক নির্যাতনে গরীবদের নিঃস্ব করে দিত। চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ছিল আরবদের নিত্যদিনের ঘটনা। তাদের এই অবস্থার বর্ণনায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

বেদুঈনরা কুফরী ও মুনাফিকিতে অধিক পারদর্শী এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্বন্ধে তারা অধিকতর অজ্ঞ। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ।[২০]

সমাজের এই অশান্তিময় অবস্থা রাসূলুল্লাহ স.-কে সারাক্ষণ কষ্ট দিত। তিনি সব সময় চিন্তা করতেন কিভাবে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়। এ কারণে আমরা দেখতে পাই নুবুওয়াতের আগেই যুবক মুহাম্মদ স. সামাজিক ন্যায়বিচার

---

১৯. আল-কুরআন, ৪২ : ১৫

২০. আল-কুরআন, ৯ : ৯৭

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর নামকরণের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

> কেননা তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁদের কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি কোন দুর্বল ব্যক্তির ওপর জুল্ম করলে তা প্রতিহত করা হবে এবং কোন স্থানীয় লোক কোন বিদেশী অভ্যাগতের হক ছিনিয়ে নিলে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।[২১]

দাওয়াতী জীবনের প্রথম দিকে একবার রাসূলুল্লাহ স. বানূ হাশিম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানে তিনি তাঁর দাওয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. "আমি তোমাদের নিকট এমন দাওয়াত নিয়ে এসেছি, যে দাওয়াত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করবে।" অর্থাৎ এর মাধ্যমে দুনিয়ায় এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে কোন অকল্যাণ ও অশান্তি থাকবে না। আর এ দাওয়াত কবুল করলে আখিরাতেও সফল হওয়া যাবে। এর কিছুদিন পর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করার সময় বলেন, فإن تقبلوا من ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخرة "আমি যে দাওয়াত পেশ করছি তা যদি তোমরা গ্রহণ করো, তাহলে তাতে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিহিত আছে।"[২২]

এখানে দুনিয়ার কল্যাণ বলতে দুনিয়ার সামগ্রিক কল্যাণকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে। সমাজব্যবস্থা নিষ্কলুষ ও নিখুঁত হবে। স্থায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। রাসূলুল্লাহর স. উদ্দেশ্য ছিল সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সেখানে ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণে কুরাইশদের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি আবার আহ্বান করেন এভাবে যে,

نَعَمْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ .

> একটি মাত্র কথা যদি তোমরা আমাকে দাও, তবে তা দ্বারা তোমরা সমগ্র আরব জাতির ওপর আধিপত্য লাভ করবে এবং যত অনারব আছে তারা তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।[২৩]

এ সব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, মর্যাদাপূর্ণ, ন্যায়-নীতিভিত্তিক ও সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মাণ করাই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর মূল উদ্দেশ্য।

---

২১. আবুল ফাদল জামালুদ্দীন ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব*, মিশর : আল মাতবা'আহ আল-আমিরিয়্যাহ, ১৮৮৫, খ. ১১, পৃ. ৫২

২২. ইব্ন হিশাম, *আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ*, দামেস্ক : দারুল খাইর, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৩১৬

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীরা যখন প্রচণ্ড বিরোধিতা ও নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছিলেন, তখন সাহাবীরা একবার রাসূলুল্লাহর স. কাছে তাঁদের নির্যাতনের কথা বলে এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দু'আ চাইলেন। তখন তিনি সাহাবীদের সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন,

وَاللَّه لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

আল্লাহর কসম, আল্লাহ এ দীনকে একদিন অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। (ফলে সর্বত্রই নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে।) এমনকি তখনকার দিনে একজন উষ্ট্রারোহী একাকী সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয়ে সে ভীত থাকবে না, এমনকি তার মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে বাঘের আশঙ্কাও তার থাকবে না। কিন্তু তোমরা (ঐ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছো।"[২৪]

এখানে রাসূলুল্লাহ স. এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিলেন, যেটা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিময়। যেখানে কোন চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ও লুণ্ঠন থাকবে না। কেউ অন্যের জান-মাল, ইজ্জত, সম্ভ্রম অন্যায়ভাবে স্পর্শ করার সাহস করবে না। বাস্তবিকই রাসূল স. এ রকম এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হিজরতের পর আদী ইব্ন হাতিম রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে তাঁকে নানাভাবে পরখ করতে লাগলেন। এ সময় রাসূল স. আগন্তুকের চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতি রেখে অনেক কথাই বললেন। এক পর্যায়ে তিনি ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন-

فَوَاللَّه لِيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ عَلَى بَعِيرِهَا (حَتَّى) تَزُورَ هَذَا الْبَيْتَ لا تَخَافُ

অচিরেই তুমি শুনবে, এক মহিলা সুদূর কাদিসিয়া থেকে একাকী তার উটে সওয়ার হয়ে এই মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে এবং সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এসে পৌঁছেছে।[২৫]

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি হিজরতের পরে মদীনার জীবনের প্রথমেই মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীদের সাথে এক ঐতিহাসিক চুক্তি করেন। যেটি ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' হিসেবে স্বীকৃত। এ সন্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে এক শান্তিময় ঐক্য গড়ে তোলেন।

---

২৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মানাকিব, পরিচ্ছেদ : আলামাতুন নুবুওয়্যাতি ফিল ইসলাম, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৩৪১৬

২৫. ইবনু হিশাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৮০

শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান দিকসমূহ

মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ স. যেমন মনে-প্রাণে কামনা করতেন সকল অন্যায়-অবিচারহীন একটি শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণের, তেমনি মদীনায় গিয়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্যই ছিল সমস্ত অন্যায়-অবিচার দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত অর্থেই মদীনায় রাসূল স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ তার সমস্ত সামাজিক সম্পর্কসহ এমনভাবে সংশোধিত হয়েছিল, যার ফলে সমাজের সকল স্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। সেখানে কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের হক নষ্ট করত না। প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করত। কারো প্রতি সামান্যতম জুলম করা হত না। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের পর নাযিলকৃত সূরা আন-নিসা এবং আল-মা'ইদাতে বর্ণিত ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ স. তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছিলেন। জীবন, জগৎ ও মানুষের মাঝে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তার ভিত্তিতে সাম্য ও ইনসাফপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল রাসূলের স. মূল লক্ষ্য। তবে এই সাম্য মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসারে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি; বরং যোগ্যতামাফিক প্রত্যেকে তার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত। আর এ সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গৃহীত রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান যে দিকসমূহ লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে,

➢ **আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একত্ব প্রতিষ্ঠা করা**

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান ভিত্তিই ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কারণ আল্লাহ তা'য়ালাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আসমান-যমীন ও এখানে যা কিছু আছে সবই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।[২৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে-

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾

---

২৬. আল-কুরআন, ৬৭ : ১

যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যার সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাকদীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।[২৭]

এছাড়া আল-কুরআনে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান, যেখানে পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সার্বভৌম ক্ষমতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. সকলকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

বলো, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটা অভিন্ন কথায় আসো যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে কেউ কাউকে প্রভু বানাবো না।[২৮]

আসলে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহকে রব, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা হিসেবে স্বীকার করে সেই অনুযায়ী গোটা সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা না করলে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম এ দিকে আহ্বান করেন। আর আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

➢ সমাজের সকলের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর আগমনের সময় মানবজাতি বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এদের কেউ কেউ নিজেদের দেবতার বংশধর মনে করত, আবার কেউ কেউ মনে করত তাদের শরীরে রাজ-রাজাদের রক্তধারা প্রবাহিত। এ কারণে তারা নিজেদেরকে অন্য থেকে শ্রেয় মনে করত। আবার কাউকে মনে করত আল্লাহ্র মস্তক থেকে সৃষ্ট । সে জন্য অন্যরা তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। অন্যদিকে কাউকে ভাবত আল্লাহ্র পদযুগল থেকে সৃষ্ট। এ কারণে তাকে অস্পৃশ্য ও কুলাঙ্গার হিসেবে গণ্য করত। সমাজের প্রভু শ্রেণিদের জন্য তাদের দাস-দাসীদের শাস্তি দেয়া বা হত্যা করাকে বৈধ মনে করা হত ।[২৯] এরকম একটি সমাজকে রাসূলুল্লাহ স. এমনভাবে পরিবর্তন করেন, যেখানে কোন মানবিক ভেদাভেদ ছিল না। সেখানে তিনি কোন ভাষাগত, দেশগত, শ্রেণিগত, বর্ণগত ও মর্যাদাগত বৈষম্যের চিহ্ন রাখেননি। এ ব্যাপারে তাঁর ঘোষণা ছিল-

---

২৭. আল-কুরআন, ২৫ : ২

২৮. আল-কুরআন, ৩ : ৬৪

২৯. সায়্যিদ কুতুব, *আল-'আদালাহ আল-ইজতিমা'ইয়্যাহ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

يا أيها الناس ! إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر ، إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فليبلغ الشاهد الغائب

ওহে মানুষেরা! নিশ্চয় তোমাদের রব এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! তাক্বওয়া ছাড়া কোন আরবের প্রাধান্য নেই আজমের উপর এবং আজমেরও প্রাধান্য নেই আরবের উপর। আর কোন লালের প্রাধান্য নেই কালোর উপর এবং কোন কালোর প্রাধান্য নেই লালের উপর। নিশ্চয় আল্লাহর দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে অধিক মুত্তাকী। সাবধান! আমি কি (রিসালাতের দায়িত্ব) পৌঁছিয়েছি? তাঁরা বললেন: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন, সুতরাং যে উপস্থিত সে যেন অনুপস্থিতের কাছে পৌঁছে দেয়।[৩০]

রাসূলুল্লাহ স. শত্রু-মিত্র, সমর্থক বা বিরোধী, মুসলিম বা অমুসলিম সবার সাথে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। নিজের নিকট আত্মীয় হলেও কোন রকম পক্ষপাতমূলক বিচার করতেন না। একবার মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈকা মহিলা চুরি করল। উসামাহ রা. তার উপর আল্লাহর বিধান কার্যকর না করার সুপারিশ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!، ثم قام فاختطَب، ثم قال: إنما أهلَك الذين قبلكم: أنَّهم كانوا إذا سرَق فيهم الشريف ترَكوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وايْم الله، لو أن فاطمة ابنة محمد سرَقت، لقطَعت يدها

তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে মানুষেরা তোমাদের পূর্ববর্তীরা এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে মর্যাদাশীল কেউ চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"[৩১]

বানু নাযীর যখন বানু কুরাইযার কাউকে হত্যা করত তখন অর্ধেক রক্তমূল্য প্রদান করত, আর যখন বানু কুরাইযা যখন বানু নাযীরের কাউকে হত্যা করত তখন তাদেরকে পূর্ণ রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হত। কিন্তু যখন আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলো-

---

৩০. মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০, হাদীস নং- ২৯৬৪

৩১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদুদ, পরিচ্ছেদ : কাত'উছ ছারিক আশ-শারীফ ওয়া গাইরিহি, রিয়াদ : দারু তাইবাহ্, ১৪২৬ হি, খ. ২, পৃ. ৮০৫, হাদীস নং-১৬৮৮

﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

আর তারা যদি কখনো (কোন বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো। যদি তুমি তাদের উপেক্ষা করো, তা হলে (নিশ্চিত থাকো), তারা তোমার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। তবে যদি তুমি তাদের বিচার-ফায়সালা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই ইনসাফ সহকারে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[৩২]

তখন রাসূলুল্লাহ স. তাদের মধ্যে সমান রক্তপণ ধার্য করেন।[৩৩] পৃথিবীর কোন বিচারক রাসূলুল্লাহ স.-এর মত ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। সত্য ও ন্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন একমাত্র তিনিই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে করে দেখিয়েছেন।

➢ সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা প্রবর্তন

রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্যতম দিক ছিল ধন-সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে তিনি বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদে পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দেন। সাথে সাথে মুসলিম সম্পদশালীদের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করেন এবং তা অনাদায়ে শাস্তির নির্দেশ দেন। এছাড়া অমুসলিমদের ওপর জিযইয়া ধার্য করেন। এর পাশাপাশি ধন-সম্পদ যাতে কারো হাতে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে সে জন্য তিনি মানুষদের ধন-সম্পদ দান করতে উৎসাহ দেন। সমাজের কল্যাণের স্বার্থে এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অকাতরে দান করতে অনুপ্রেরণা দান করেন। তিনি নিজেও কোন সম্পদ নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখতেন না। এ ব্যাপারে আবু যার আল-গিফারী রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

كنت أمشي مع النبي صلي الله عليه و سلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال (يا أبا ذر) . قلت لبيك يا رسول الله قال (ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا) . عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا - عن يمينه وعن شماله ومن خلفه - وقليل ما هم)

---

৩২. আল-কুরআন, ৫ : ৪২

৩৩. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়াহ, পরিচ্ছেদ : আল-হুকম বাইনা আহলিল যিম্মাহ, হাদীস নং- ৩১২০

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآيَةَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِى النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمْ.

একবার আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মদীনার কঙ্করময় প্রান্তরে হেঁটে চলছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ আমাদের সামনে পড়ল। তখন তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম, লাব্বাইক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমার নিকট এ উহুদ পরিমাণ সোনা হোক আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যতীত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক, তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি তা আমি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডানদিকে, বামদিকে ও পেছনের দিকে বিতরণ করে দেই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, জেনে রেখো, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্যই যারা এভাবে, এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পেছনে ব্যয় করবে, তারা এর ব্যতিক্রম। তবে এ জাতীয় লোক অতি অল্পই।[৩৪]

এমনকি বেশি মুনাফা করার আশায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্য সামগ্রী আটকে রাখাকে তিনি অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطئ

যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে রাখল সে পাপী ও অপরাধী।[৩৫]

➤ **জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা**

রাসূলুল্লাহ স. তার প্রতিষ্ঠিত সমাজে সকলের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। অপরের ধন সম্পদ জবর দখল, আত্মসাৎ ও লুণ্ঠন করাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন,

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين

যে অন্যায়ভাবে অপরের জমির এক বিঘত পরিমাণ অংশও জবর দখল করবে, তার গলায় সপ্ত যমীনের হার ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[৩৬]

তিনি আরো বলেন,

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة

যে কোন মুসলমানের অধিকার কেড়ে নিবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৩৭]

---

৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আর-রিকাক, পরিচ্ছেদ : কওলুন্নাবিয়্যি স. : মা ইয়াসুররুনী..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬০৭৯

৩৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুল ইহতিকার ফিল আকওয়াত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৪, হাদীস নং-১৬০৫

৩৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুয জুলম ওয়া গাছবিল আরদ ওয়া গাইরিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৬-৫৭, হাদীস নং-১৬১২

৩৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায়: আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ: অ'ঈদ মান কাতা'আ হাক্কা মুসলিমিন বি ইয়মিনিহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৭৩, হাদীস নং-১৩৭

তিনি কঠোর ভাষায় বলেন,

كلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ হারাম।[৩৮]

এ কারণে অন্যের অধিকার আদায়ের বেলায় কোনরকম শৈথিল্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রত্যেকে অপরের অধিকারের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকবে। উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, শ্রমিক-মজুরসহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের নিজ নিজ হকের ব্যাপারে যদি প্রত্যেকে নজর রাখে তাহলে এক শান্তিময়, সৌহার্দপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আল্লাহর রাসূল স. বলেন, আল্লাহ বলেছেন :

ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

কিয়ামতের দিনে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে, যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে এবং যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়োগ করে সম্পূর্ণ কাজ আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তাকে মজুরী প্রদান করেনি।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সমাজে সকলের পূর্ণ মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করেন। তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সাদা-কালো নির্বিশেষে প্রত্যেককে তার মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করতেন। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করে কোন কথা বলতেন না এবং কেউ সেটা করলে তা অপছন্দ করতেন। এমনকি তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন,

لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُه

আমাকে তোমরা সে রকম উচ্চ প্রশংসা করো না, যেমনটি খ্রিস্টানরা ঈসা ইব্‌ন মার্‌ইয়ামকে করেছিল। আমি তো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।[৪০]

যুদ্ধবন্দী শত্রুদেরকেও তিনি ন্যায়সঙ্গত মানবিক মর্যাদাদানের নির্দেশ দেন। অন্যায়ভাবে তাদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। তিনি বলেন,

مَن قتَل قتيلاً من أهل الذّمة، لَم يجد ريح الجنة، وإن ريحَها ليُوجَد من مسيرة أربعين عامًا

---

৩৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : তাহরীমু যুলমিল মুসলিমীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৯৩, হাদীস নং- ২৫৬৪

৩৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : ইছমু মান বা'আ হুররান, হাদীস নং- ২১১৪

৪০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ : অজকুর ফিল কিতাব মারয়ামা ইজিনতাবাজাত, হাদীস নং- ৩৪৪৫

যে ব্যক্তি যিম্মীদের কাউকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ অবশ্যই পাওয়া যাবে।[৪১]

এছাড়া আল্লাহর রাসূল স. স্বয়ং সব সময় ভয়ে থাকতেন যে, কাউকে জুল্‌ম করে বসেন কিনা। একবার এক মুনাফিক রাসূলুল্লাহর স. ন্যায়বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি জবাবে বলেন, من يطع الله إذا عصيت؟ 'আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তবে কে তাঁর আনুগত্য করবে?'[৪২]

➢ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ স. মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি খেয়াল রাখতেন। তবে এ স্বাধীনতা অবশ্যই লাগামহীন স্বাধীনতা নয়, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি শুধু ভোগ বিলাস ও নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। বরং এটি একটি সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে যেমন নারী-পুরুষ উভয়কে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার দান করেছেন, তেমনি বৈষয়িক বিষয়েও উভয়ের মতামত ও স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت

বিবাহিত রমণীর প্রকাশ্য সম্মতি ছাড়া তাকে পুনর্বিবাহ দেয়া যাবে না এবং অবিবাহিতদের অনুমতি ছাড়া তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না। আর তার সম্মতি হলো চুপ থাকা।[৪৩]

ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ স. এমন একটি জাগতিক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যেখানে মানুষ ইনসাফের সাথে যুক্ত হতে এবং এর জন্য সব রকমের দুঃখ-কষ্ট মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। ব্যক্তির মধ্যে যদি ন্যায়ের চেতনাবোধ না থাকে তবে শুধু আইনের দ্বারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একারণে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ স.-এর সমাজে অনেকে স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করত। প্রখ্যাত সাহাবী মা'ইজ ইব্‌ন মালিক রা. একবার রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেন।[৪৪] তিনি অপরাধীকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য রিমান্ডে নেননি। তার ওপর কোন জোর প্রয়োগ করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ স. এমন এক স্বাধীন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি

---

৪১. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : তা'জীমু কাতলিল মু'আহিদ, হাদীস নং- ৬৯৫২

৪২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আম্বিয়া, পরিচ্ছেদ : ক্বাওলিল্লাহি তা'য়ালা.., হাদীস নং- ৩১৬৬

৪৩. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ্, পরিচ্ছেদ : মা জা'আ ফী ইসতি'মারিল বিকর্ ওয়াস সাইব, হাদীস নং-১১০৭

৪৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদুদ, পরিচ্ছেদ : মান ই'তারাফা 'আলা নাফসিহি বিয যিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৯৫

করেছিলেন, যেখানে অপরাধী নিজ থেকেই অপরাধ স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। এছাড়া তিনি ঐ সাহাবীর কাছে এটাও জানতে চাননি যে, কার সাথে সে যিনা করেছে। আজ্‌দ গোত্রের এক মহিলার একই রকম যিনা স্বীকার করার ঘটনাও হাদীসে এসেছে। সেখানেও রাসূলুল্লাহ স. তাকে জবরদস্তি করে স্বীকারোক্তি আদায় করেননি। আবার তার সাথে যিনাকারী পুরুষের ব্যাপারেও জানতে চাননি। তবে অপরাধী প্রমাণ হওয়ার পর তাকে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেননি। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের নমুনা।

➢ পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

সমাজের প্রত্যেক শ্রেণি-পেশার মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ ছাড়া শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করা সম্ভব না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ স. সবাইকে দায়িত্বশীল হবার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।[৪৫]

তিনি সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাকে স্পষ্ট করেছেন। ব্যক্তি ও তার সত্তা, ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তি ও পরিবার, এক জাতির সাথে অন্য জাতির, প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর- সবার মাঝে তিনি এক মজবুত পাস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

তোমরা নিজেদের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।[৪৬]

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সমাজে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য পাহাদার হতে হবে। স্বাধীনতার অজুহাতে সমাজের কোথাও ক্ষতিকর কোন কিছু করার অধিকার কারো নেই। বরং সকলের দায়িত্ব পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর রাখা। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল স. একটি চমৎকার উপমা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

---

৪৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আতু ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, হাদীস নং- ১২৮৪

৪৬. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

مَثَلُ القَائِم عَلَى حُدُود اللّٰه وَالوَاقِع فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَة، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاء مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا

আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা যারা মেনে চলে, আর যারা তা অতিক্রম করে তাদের উদাহরণ হলো- যেমন কিছু লোক একটি জাহাজে আরোহণ করল। তাদের কিছু লোক জাহাজের উপর তলাতে থাকতে এবং কিছু নীচের তলাতে থাকার জন্য স্থান বেছে নিল। যারা নীচের তলায় অবস্থান করছে তাদের পানি পান করার জন্য উপর তলার লোকদের নিকট যেতে হয়। সুতরাং নীচের তলার লোকেরা বলল- আমরা যদি পানির জন্য নীচে একটি ছিদ্র করে নিতাম এবং উপরের তলার লোকদের কষ্ট না দিতাম তাহলে কতইনা ভালো হত। অতএব, লোকেরা যদি নীচের তলার লোকদের ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দেয় তাহলে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখে তাহলে তারা নিজেরা মুক্তি পাবে এবং সাথে সাথে সবাই ধ্বংস থেকে মুক্তি পাবে।[৪৭]

আলোচ্য হাদীসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার যে ধ্বংসাত্মক পরিণতি তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বরং এখান থেকে অনুধাবন করা যায়, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে সবাইকে অপরের কল্যাণের বিষয় ভাবতে হবে। আর তা না হলে সমগ্র সমাজ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিপতিত হবে। কিন্তু আজকের বিশ্ব-ব্যবস্থা রাসূলের স. এ শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। নিজের, নিজের পরিবারের, নিজের জাতির বা নিজের দেশের সামান্য স্বার্থের জন্য অন্যের, অন্যের পরিবাবের, অন্য জাতির বা অন্য দেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। এমনকি বাড়ির পর বাড়ি, শহরের পর শহর, দেশের পর দেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে জান-মাল ও ফসলাদি। একদিকে অত্যাচারী এভাবে অন্যের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্ব-বিবেকও সবকিছু নীরবে সহ্য করছে। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কেউ কোথাও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আর সে জন্যই সারা বিশ্ব আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। অথচ আল্লাহর রাসূল স. বলেন,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ দেখবে, সে সেটা হাত দিয়ে তা প্রতিহত করবে। এতে যদি সে সক্ষম না হয় তবে সে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করবে।

---

৪৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শারিকাহ্, পরিচ্ছেদ : আল- কুর'আহ ফিল মুশকিলাত, হাদীস নং-২৪৯৩

তাতে সে সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে এর প্রতিবাদ করবে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।[৪৮]

যারা মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন চালায় তাদের প্রতিহত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. বলেন-

لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না তোমরা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক পথ গ্রহণ করতে বাধ্য না করবে।[৪৯]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন-

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। এরপর তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।[৫০]

নবী স. শুধু এ ব্যাপারে ভয়-ভীতি দেখাননি, বরং তিনি পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل

বিধবা, দরিদ্র ও মিসকিনদের উপকারার্থে যারা চেষ্টা করবে তারা স্বীয় কাজের দিক দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা দিনভর রোজাদার এবং রাত্রিভর নফল নামায আদায়কারীর সমতুল্য ব্যক্তি।[৫১]

বিশেষ করে তিনি মুসলিম জাতিকে একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল হবার জন্য বলেন,

مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمَّى

---

৪৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল- ঈমান, পরিচ্ছেদ : বায়ানু কাওনিন নাহয়ি 'আনিল মুনকার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২, হাদীস নং- ৪৯

৪৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* পরিচ্ছেদ : সূরাহ্ আল-মা'ইদাহ্, হাদীস নং-৩০৪৭

৫০. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* পরিচ্ছেদ : আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহয়ু 'আনিল মুনকার, হাদীস নং- ২১৬৯

৫১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মাগাযী , পরিচ্ছেদ : বা'আছা আবি মুসা ওয়া মু'আয ইলাল ইয়ামান, হাদীস নং- ৪০০০

> পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির বেলায় মুসলিম জাতি একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যদি আক্রান্ত হয় তবে তার জন্য সমস্ত শরীর জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় ব্যথিত হয়ে পড়ে।[৫২]

➢ পরামর্শভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল পরামর্শের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করা। আল-কুরআনের নির্দেশনা, ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ "কোন কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করে নিন"[৫৩] এবং ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ "তাদের কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে হয়"[৫৪] কে তিনি পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করতেন। এভাবে পরামর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর কর্মের একটি মূলনীতি ছিল। তবে যে সব কাজ ওহী দ্বারা পরিচালিত হত তা তিনি ওহীর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করতেন।

➢ সংখ্যালঘুদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

মুসলিম রাষ্ট্রে রাসূলুল্লাহ স.-এর শাসনাধীনে অমুসলিমরা বসবাস করলেও তাদের সাথে তিনি কখনো অন্যায় আচরণ করেননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে অমুসলিমরা পূর্ণ অধিকার ভোগ করত। তিনি নিজে যেমন তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতেন তেমনি অন্যদেরকেও তাদের সাথে ন্যায় আচরণের নির্দেশ দিতেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ, ব্যক্তি মর্যাদা বা বংশ মর্যাদা কোনটার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। যদিও হকের অধিকারী অমুসলিম ব্যক্তিটি মুসলিমদের নির্যাতন করে থাকুক। তিনি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে লক্ষ্য রাখতেন,

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

> আর যদি বিচার কর তবে তাদের মধ্যে সুবিচার করো। নিশ্চই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[৫৫]

অমুসলিম বা যাদের সাথে কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ, তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবীদের খুব তাগিদ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রায় ত্রিশটির বেশি হাদীস পাওয়া যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ বলেন,

ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ له شيئًا بغير حقه، فأنا حجيجه يوم القيامة

---

৫২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : নাছরুল আখি জালিমান আও মাজলুমান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০১, হাদীস নং- ২৫৮৬

৫৩. আল-কুরআন : ৩ : ১৫৯

৫৪. আল-কুরআন : ২৬ : ৩৮

৫৫. আল-কুরআন, ৫ : ৪২

সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে বা তার হক কম দিবে অথবা তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দিবে কিংবা অন্যায়ভাবে তার সামান্যতম হক নিয়ে নিবে, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বিবাদ করব।[৫৬]

এছাড়া তিনি আরো বলেন,

من قتل معاهدًا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ্ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৫৭]

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ও তাঁর সাহাবীরা হুনাইনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ছাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ তখনো মুশরিক ছিলেন। তিনি ছিলেন মক্কার বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে অনেক অস্ত্র ছিল। যুদ্ধের জন্য রাসূল-এর কিছু ঢালের প্রয়োজন হলো। তিনি ছাফওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছাফওয়ান, তোমার কাছে কোন অস্ত্র আছে? ছাফওয়ান বললেন, কর্জ নিবেন নাকি জোর করে নিবেন? তিনি বললেন, না, বরং কর্জ নেব। অতঃপর ছাফওয়ান রাসূলুল্লাহ স. কে ৩০-৪০ টি ঢাল ধার দিলেন। রাসূল স. যুদ্ধ করলেন। মুশরিকরা পরাজিত হলো। এরপর ছাফওয়ানের ঢালগুলো একত্রিত করা হলো। এর মধ্যে কয়েকটি ঢাল হারিয়ে গেল। রাসূল স. তাঁকে বললেন, আমরা তোমার কয়েকটি ঢাল হারিয়ে ফেলেছি। আমরা কি তোমাকে জরিমানা দিব? তিনি বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। কেননা আজকে আমার অন্তরে এমন জিনিস আছে, যা সেদিন ছিল না।[৫৮]

নিজের বিজয় করা এলাকার একজন মুশরিকের কাছ থেকে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জোর করে একটি অস্ত্রও নিলেন না। এমনকি তা থেকে কয়েকটি হারিয়ে গেলে নিজ থেকেই জরিমানা দিতে চাইলেন। অথচ আজকে আমরা দেখতে পাই, ক্ষমতার জোরে মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সবকিছু হারিয়ে মাজলুম নীরবে চোখের পানি ফেলছে।

---

৫৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : ফী তা'শীরি আহলিজ জিম্মাহ্ ইজা ইখতালাফু, হাদীস নং- ৩০৫৪

৫৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াফা লিল মু'আহিদ, হাদীস নং- ২৭৬২

৫৮. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : ফী তাদমীনিল 'আরিয়াহ্, হাদীস নং- ৩৫৬৫

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ ». قَالَ عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا قَالَ « لاَ بَلْ عَارِيَةً ». فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِصَفْوَانَ « إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ». قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ.

আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ১৩০ জন লোক ছিলাম। (সবাই খুব ক্ষুধার্ত ছিল)। রাসূল স. বললেন, তোমাদের কারো নিকট কোন খাবার আছে? একজনের কাছে এক 'ছা' পরিমাণ খাবার ছিল। সেটা মেশানো হলো। অতঃপর একজন মুশরিক একদল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূল স. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি বিক্রির জন্য নাকি দানের? মুশরিক বলল, না, বরং এটি বিক্রির জন্য। অতঃপর তিনি তার থেকে একটি বকরী ক্রয় করলেন। অতঃপর সেটি প্রস্তুত করা হলো।[৫৯]

প্রচণ্ড ক্ষুধাসহ ১৩০ জন সাহাবী নিয়ে তিনি একজন মুশরিককে একাকী পেয়েও তার সম্পদ জোর করে কেড়ে নিলেন না। এভাবে ইসলামের বিজয়ের দিনেও তিনি সংখ্যালঘুদের সাথে সামান্যতম অন্যায় আচরণ করেননি। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে কোন কার্পণ্য ও অন্যায় হস্তক্ষেপ করেননি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নের ঘটনা থেকেও জানতে পারি,

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা একজন ইহুদীর কাছ থেকে নেওয়া ত্রিশ ওয়াসাক খেজুর ঋণ রেখে ইন্তিকাল করেন। ঋণ পরিশোধের দিন আসল। কিন্তু জাবির রা. তখন ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম ছিলেন না। এ জন্য তিনি ইহুদির কাছে সময় চাইলেন। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করল এবং তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে চাপ দিল। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের মধ্যে মধ্যস্থতা করলেন। তিনি ইহুদীকে অনেক কথা বলে সময় দেয়ার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু সে একবারেই অস্বীকার করল এবং বলল : 'হে আবুল কাসেম, আমি তাকে সময় দেব না। রাসূলুল্লাহ স. তখন ইহুদীর মদীনায় বসবাসের অবস্থার দিকে তাকালেন না, তিনি মুসলিমদের সাথে ইহুদীদের শত্রুতার বিষয়েও নজর দিলেন না। বরং তিনি দেখলেন যে, হক ইহুদীর এবং সেটাকে আদায় করা ওয়াজিব। তিনি ইহুদীর সাথে ন্যায়বিচার করলেন। তাকে তার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।[৬০] এই সম্মানিত সাহাবীর সাথে রাসূলের স. যে ঘনিষ্ঠতা ছিল সে দিকে রাসূলুল্লাহ স. ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বরং তিনি শরীয়তের বিধানের দিকে খেয়াল রাখলেন। আল-কুরআনের এই আয়াতের বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখলেন,

---

৫৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ : আশ-শিরা' ওয়াল বাই মা'আল মুশরিকীন..., হাদীস নং- ২৬১৮

عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه و سلم (بيعا أم عطية ؟ أو قال هبة) . قال لا بل بيع فاشترى منه شاة

৬০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-ইস্তিকরাদ, পরিচ্ছেদ : ইযা কাসস..., হাদীস নং- ২২৬৬

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে গেলেও তোমরা আল্লাহর (পক্ষে) সাক্ষী হিসেবে ন্যায়ের উপর অটল থাকবে। (সাক্ষ্য যার বিরুদ্ধে যাবে) সে ধনী হোক কিংবা গরীব হোক আল্লাহ্ই উভয়ের ভাল রক্ষক। অতএব তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, পাছে (ন্যায় থেকে) বিচ্যুত হও। আর যদি তোমরা (সাক্ষ্য) ঘুরিয়ে দাও কিংবা এড়িয়ে যাও তাহলে (জেনে রাখবে) তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।[৬১]

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত। কিন্তু আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা ঠিক এর ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। দখলদার বাহিনী একের পর এক দেশ ধ্বংস করছে। তাদের জান-মাল নষ্ট করছে। যমিনে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করছে। কোন ন্যায়-অন্যায় বিচার করছে না। একই দেশের মধ্যে ক্ষমতাশালীরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর একই ধরনের অত্যাচার করছে। অন্যায়ভাবে বিরোধীদের সম্পদ দখল করে নিচ্ছে। তাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করছে। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে তেমন কিছু যেন অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতা থাকলে সবকিছু করা বৈধ মনে করা হচ্ছে।

➢ পরকালীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

সমাজে শান্তি-শৃঙখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ স. শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের পাশাপাশি সকলকে পরকালীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং পরকালীন জবাবদিহিতার ব্যাপারে সতর্ক করতেন। পরকালীন পুরস্কারের ঘোষণার সাথে সাথে কঠিন আযাবের ভয় দেখাতেন। যাতে মানুষেরা পরকালের কল্যাণের আশায় দুনিয়ার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। যেমন তিনি বলেছেন,

كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته

তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, খাদেম তার মনিবের মালের দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্বের ব্যাপারে

---

৬১. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৬২]

এছাড়া তিনি আরো বলেন,

ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলে সে যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে তার দায়িত্বের খেয়ানতকারী, তাহলে তার ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৬৩]

পরকালীন চেতনা বেশি করে জাগ্রত করতে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ স. জুল্‌ম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণির ওপর ক্ষমতাবানদের জুল্‌মের ব্যাপারে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তাই সেটা গরীবদের ওপর ধনীদের জুল্‌ম হোক, অথবা শাসিতের ওপর শাসকশ্রেণির জুল্‌ম হোক। অত্যাচারিত ব্যক্তি যত বেশি দুর্বল হবে অত্যাচারীর অপরাধ ততই বড় হিসেবে গণ্য হবে।[৬৪] হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

হে আমার বান্দা! আমি জুল্‌ম করাকে নিজের উপর হারাম করেছি এবং এটাকে তোমাদের মধ্যেও হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুল্‌ম করো না।[৬৫]

রাসূলুল্লাহ স. একবার মু'আয রা. কে বললেন,

واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه و بين الله حجاب

তুমি মাজলুমের ফরিয়াদ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।[৬৬]

তিনি জুল্‌মকারীর প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন-

إن الله عز وجل يُعذّب الذين يعذبون الناس في الدنيا

নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়ায় মানুষদের শাস্তি দিবে।[৬৭]

---

৬২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ্, পরিচ্ছেদ : ফাদিলাতুল ইমাম আল-'আদিল ওয়াল হাস্‌সু আলার রিফক বির রা'ইয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস নং-১৮২৯

৬৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : ইসতিহকাকুল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদীস নং-১৪২

৬৪. ইউসুফ আল-কারযাবী, *মালামিহুল মুজতামা'ইল মুসলিম আল্লাযী নুনশিদুহ*, বৈরুত : মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ্ লিত তিবা'আহ ওয়ান নাশর, ২০০১, পৃ.১৩৫

৬৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বিররি ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব পরিচ্ছেদ : তাহরীমুজ জুলম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৯৮, হাদীস নং- ২৫৭৭

৬৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল- আদাব, পরিচ্ছেদ : আস-সা'য়ী আলাল আরামিলাহ, হাদীস নং- ৫৬৬০

৬৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বিররি ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব পরিচ্ছেদ : আল-অ'ঈদ আশ-শাদীদ লিমান 'আজ্জাবান নাস বি গাইরি হাক্ক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১২১০, হাদীস নং- ২৬১৩

তিনি আরো বলেন-

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

তিন ব্যক্তির দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না- ন্যায়পরায়ণ নেতা, আর রোযাদার যখন ইফতার করে এবং মাজলুমের দু'আ। আল্লাহ এটাকে মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং এর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেন। আর প্রভু ঘোষণা করেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব, যদিও তা পরে হয়।[৬৮]

এর পাশাপাশি তিনি ন্যায়বিচারকের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন-

إنَّ المقسطين عند الله على منابرَ من نور عن يمين الرحمن - عز وجل

দুনিয়ায় সুবিচারকারীরা তাদের সুবিচারের কারণে কিয়ামতের দিন মহান দয়াময়ের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বারে অবস্থান করবে।[৬৯]

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতী জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এমন এক ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা, যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করবে। সাথে সাথে অপরের অধিকার আদায়ে অগ্রগামী হবে। কোন রকম জুলুম-নির্যাতনের আশ্রয় নেবে না। আর এ কাজে তিনি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যও সংগ্রাম করেছেন। আর এটা সম্ভব করেছিলেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে এক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি শরীয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করেননি। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সকলের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। সর্বোপরি তিনি সকলকে পরকালীন চেতনায় জাগ্রত করেন। আখিরাতের কঠিন আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেন। বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

৬৮. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ- দা'ওয়াত, পরিচ্ছেদ : ফিল 'আফ্ভি ওয়াল 'আফিয়্যাহ , হাদীস নং-৩৫৯৮

৬৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ্, পরিচ্ছেদ : ফাদীলাতুল ইমাম আল-'আদিল ওয়া 'উকবাতুল জাইর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস নং-১৮২৭

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

ইসলামের আলোকে ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কুফল ও তা থেকে বাঁচার উপায়

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম*

[**সারসংক্ষেপঃ** *বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সাড়াজাগানো আলোচিত বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট। সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, পড়া-লেখায়, গবেষণায়, ছবি, ভিডিও, ফেসবুক, টুইটার, ই-মেইলসহ নানা কাজে এর ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এটি নিজে কোন মন্দ বস্তু নয়। ব্যবহারকারী একে যেভাবে ব্যবহার করে এটি সেভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, তরবারী, এটি স্বভাবতই একটি মন্দ বস্তু নয়; তবে এটিকে ভাল বা মন্দ দু'কাজে বা উপায়ে ব্যবহার করা যায়। একজন নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অনায়াসেই বা অজান্তেই এর এমন সাইটগুলোতে প্রবেশের পথ জানতে পারে, আবার কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় এর অপব্যবহার করতে পারে, যা তার জন্য নৈতিকতা বিরোধী ও ক্ষতিকর। তাই একজন মুসলিম ব্যবহারকারী ইসলামের দিক নির্দেশনা জেনে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে এর ভালো দিকগুলোর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। বর্তমান সময়ে সুউচ্চ অট্টালিকার দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দা'ওয়াতী কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় ইন্টারনেট হতে পারে দা'ওয়াতী কাজের এক বিশ্বমঞ্চ। যার মাধ্যমে একজন দা'ঈর বক্তব্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে দিতে পারেন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইন্টারনেট পরিচিতি, এর ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সদ্ব্যবহারের সুফল, অপব্যবহারের কুফল, তা থেকে বাঁচার উপায় ও কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।*]

ভূমিকা

ইন্টারনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া বা মাধ্যম। মিডিয়াকে বলা হয় সমাজের আয়না। এটি দু'ধরনের, প্রিন্ট মিডিয়া (খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি) ও ইলেক্ট্রনিক বা ওয়েব মিডিয়া (টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি)। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, মোবাইল, কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়েছে বর্তমান প্রযুক্তির সর্বাধিক উন্নত সংস্করণ ইন্টারনেট। এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, গবেষণা, পত্র-পত্রিকা পাঠ, মুহূর্তেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা কোন স্থানে তথ্য লেন-দেন ও যোগাযোগ করা যায় এবং হিসাব-নিকাশ থেকে শুরু করে এমন কোন কাজ নেই যাতে এর ব্যবহার নেই।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এটি ব্যবহার করছে ছাত্র-শিক্ষক, নারী-পুরুষ, অফিসার-কর্মচারী, ছোট-বড় সকলেই। একজন মুসলিমকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে পথ চলার জন্য হালাল-হারাম যাচাই-বাছাই করে চলা আবশ্যক। এটি প্রত্যাশিত যে, প্রতিটি সচেতন মুসলিম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হারাম পথ পরিহার করে যাবতীয় কাজ পরিচালনার করবেন; পাশাপাশি এর মাধ্যমে নিজেকে একজন দা'ঈ তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী হিসেবে মানুষকে আহ্বান করবেন।

ইন্টারনেট পরিচিতি

ইন্টারনেট অর্থ আন্তজাল। এটিকে নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক বলা হয়। ইন্টারনেট সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এমন একটি বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তের কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় নানা তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা যায়।[১] ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ Advanced Research Projects Agency (ARPA) নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যাতে যুদ্ধের সময়েও এক সামরিক ঘাঁটি থেকে অপর ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই নেটওয়ার্ককে বলা হয় আরাপানেট (ARPANET)। এখান থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়।[২] ইন্টারনেটের মূলে রয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www), আর এর জনক টিম বার্নার্স লী।[৩] ভিনসেন্ট জিগনা ও মাইক পেপার ইন্টারনেটের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।[৪] মূলত ইন্টারনেটওয়ার্ক (internetwork) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল ইন্টারনেট। বিশেষ গেটওয়ে বা রাউটারের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলো একে অপরের সাথে সংযোগ করার মাধ্যমে এটি গঠিত হয়। ইন্টারনেটকে অনেকসময় সংক্ষেপে নেট বলা হয়।[৫]

---

১. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *ব্যবহারিক কম্পিউটার শব্দকোষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ১১০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৩. www.internet wikipedia. Encyclopedia. 23/05/2015.

৪. তাঁর মতে, "The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard Internet protocol suite (TCP/IP) to link several billion devices worldwide. It is an international *network of networks* that consists of millions of private, public, academic, business, and government packet switched networks, linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies." [*The Internet Explained*, Vincent Zegna & Mike Pepper, Sonet Digital, November 2005, Pages 1-7.]

৫. www.internet wikipedia. Encyclopedia. 23/05/2015.

ইন্টারনেটের ব্যবহার

ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় কম্পিউটার, মডেম, ইন্টারনেট সংযোগ, সফটওয়্যার ইত্যাদি। এটি অনলাইন ও অফলাইনের মাধ্যমে ব্যবহার হয়ে থাকে।[৬] ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপী মানুষকে ফলপ্রসূভাবে এবং সুলভে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করেছে। সনাতনী প্রচার মাধ্যমসমূহ যেমন রেডিও, টেলিভিশনের মতই ইন্টারনেটের কোন কেন্দ্রীভূত সরবরাহ পদ্ধতি নেই। তার পরিবর্তে যে কোন ব্যক্তি যার ইন্টারনেট সংযুক্তি আছে সে সরাসরি অন্য যে কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে, অন্যের জন্য তথ্য সরবরাহ করতে, অন্যের দেয়া তথ্য সংগ্রহ করতে অথবা উৎপাদিত পণ্যসমূহ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। তথ্য খোঁজার পাতার মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে হয়। আর এটি হচ্ছে একটি প্রোগ্রাম যেমন মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স, অপেরা, গুগল যা কম্পিউটারের তথ্যাদির পৃষ্ঠা, চিত্র, রেখাচিত্র, শব্দ, চলমান ছবি ও মডেলসমূহ উপস্থাপন করে। শুরুতে এর ব্যবহার খুব সীমিত থাকলেও বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সার্ভিস, ই-মেইল সার্ভিস, এফটিপি বা ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল, টেলনেট, রিমোট বা ইন্টারনেট প্রিন্টিং, রিমোট স্টোরেজ, নিউজ গ্রুপ, ভিওটি বা ভয়েস ওভার টেলিফোন, ইনস্ট্যান্ট মেসেজ, ভিডিও কনফারেন্সিং, ইন্টারনেট চ্যাটিং প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৬ জুন ১৯৯৬ সাল থেকে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক (ISN)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট সেবার কাজ শুরু হয়।[৭] যুক্তরাষ্ট্রের পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষার তথ্য মতে, বাংলাদেশের ১১ শতাংশ মানুষ অন্তত একবার হলেও ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন। ভারতে ২০ শতাংশ, পাকিস্তানে ৮ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ২৪ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে সবচাইতে বেশি ৮৭ শতাংশ, এরপরই আছে রাশিয়া ৭৩ শতাংশ। বাংলাদেশী ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৬২% চাকরি খোঁজেন ও আবেদন পাঠান, পরিবার ও বন্ধুদের সাথে যুক্ত থাকেন ৬% এর বেশি। সরকারি তথ্য খোঁজেন ২৬%, স্বাস্থ্যসেবার তথ্য খোঁজেন ২৮%, রাজনৈতিক তথ্যের খোঁজ করেন ৫৬%, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ১৩%, পণ্য কেনা-বেচার হার ২৩%, পাঠ দানের হার মাত্র ৭%।[৮]

---

৬. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১; [দ্রঃ মোস্তাফা জব্বার, *কম্পিউটার অভিধান*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬; *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞানকোষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।]

৮. জাহিদ আবদুল্লাহ, *দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হালচাল*, http://www.ntvbd.com/bangladesh/4275. ২০ মার্চ ২০১৫

ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আজকের বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদপত্র পাঠ, তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান, যোগাযোগ, হিসাব সংরক্ষণ, ফাইল ও ডাটাবেজ সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণার কাজ, কেনা-কাটা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিক যোগাযোগ, বিনোদন, লাইভ ভিডিও কনফারেন্স, কুরআন-হাদীস চর্চা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দান, ইসলামের শত্রুদের জবাব দান, আল-মাকতাবাতুশ শামিলার ব্যবহার, অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম, নৈতিক চরিত্র গঠন ও উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কাজ শেষ করতে অনেকগুলো মানুষের প্রয়োজন হয়, যে কাজ করতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয় তা স্বল্প সময় ও স্বল্প অর্থ ব্যয়ে অতি দ্রুততার সাথে নিপুণভাবে শেষ করা যায়। তাই দিন দিন ইন্টারনেটের উপর মানুষের নির্ভরতা বাড়ছে।

আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ড. মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন,

> আমরা ইন্টারনেটের মোকাবেলা করতে পারি ইন্টারনেটের সাহায্যে, কম্পিউটারের মোকাবেলায় কম্পিউটার, কলমের মোকাবিলা করতে পারি কলমের সাহায্যে। আমরা উটের পিঠে চড়ে ল্যান্ডক্রুজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারি না।[৯]

তাই বিশ্বায়নের এ যুগে মুসলিমদের দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এমনিভাবে মুসলিম ও মুসলিম উম্মাহর কাছে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য ইন্টারনেট হতে পারে একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এমতাবস্থায় ইসলাম নিয়ে যারা ভাবেন, ইসলামের প্রসারই যাদের কাম্য ও কর্ম, তাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ইসলাম প্রচারে ইন্টারনেটকে কাজে লাগানো এখন সময়ের দাবি। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম সম্পাদনের এক যুগোপযোগী মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ মানুষকে ভালো কাজের প্রতি আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান পৌঁছাতে পারে। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

> তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানব কল্যাণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজে আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে।[১০]

---

৯. *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম,* মার্চ ১৫, ২০১৪; *সাপ্তাহিক সোনারবাংলা,* ফেব্রুয়ারী ১৩, ২০১৫

১০. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

তিনিই উম্মীদের নিকট তাদের একজনকে রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁরই আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদের পবিত্র করবেন এবং শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমত, ইতঃপূর্বে তারা ঘোর গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।[১১]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ, لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوزارِهِمْ شَيْئًا

যে হিদায়তের দিকে আহ্বান করে, এই হিদায়তের যত অনুসারী হবে তাদের প্রতিদানের সমতুল্য প্রতিদান সে পাবে। তবে তাদের (অনুসারীগণের) প্রতিদানে কোন সংকোচন করা হবে না। যে গুমরাহীর কাউকে আহ্বান জানাবে তার উপর এর অনুসারীদের গুনাহও আপতিত হবে। এতে তাদের গুনাহে কোন সংকোচন করা হবে না।[১২]

তিনি আরো বলেন,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان

যে কেউ কোন অসৎ কিছু দেখবে, তা যেন তার হাত (শক্তি প্রয়োগ) দ্বারা প্রতিহত করে, অতঃপর এতে সামর্থ্য না থাকলে মৌখিকভাবে প্রতিহত করবে, এতেও সক্ষম না হলে, অন্তরের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটি দূর্বলতর ঈমানের পর্যায় বটে।[১৩]

এসব আয়াত ও হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত এবং মন্দ কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধমে মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপশি এর ভালো দিকগুলো গ্রহণ ও ক্ষতিকর দিকগুলো বর্জন করার আহ্বান পৌঁছে দেয়া যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর অপব্যবহারকারীদেরকে সতর্ক করা যায় এবং এর ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো প্রচার করলে অপব্যবহারকারীগণ আশু ক্ষতির হাত থেকে সহজেই বাঁচতে পারবে।

---

[১১]. আল-কুরআন, ৬২ : ২

[১২]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ইলম, পরিচ্ছেদ : মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান, *মুখতাসারু সহীহ মুসলিম*, কুয়েত : ১৯৬৯, খ. ১, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং- ৬৯৮০

[১৩]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ঈমান, পরিচ্ছেদ : বায়ানু আন্না আননাহয়ি আনিল মুনকার মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা আয়াযীদু ওয়া ইয়ানকুসু, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস নং- ৪৯

আগে সমাজ সংস্কারকগণ বাজারে, মসজিদে ও বিভিন্ন লোক সমাগমস্থলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এ উৎকর্ষের যুগে একজন দা'ঈ ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন কোটি কোটি লোকের দুয়ারে। ইতোমধ্যে বিশ্বে মুসলমানগণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট খুলে ইসলামী প্রোগ্রাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে পাশ্চাত্যের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হচ্ছে এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছে। এককথায় বিশ্বকে এক কক্ষে নিয়ে আসার মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। এর মাধ্যমে আরো ব্যাপক দা'ওয়াতী কাজের বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরি ও তথ্য অনুসন্ধানসহ মানুষের বিভিন্ন কাজে এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে দিন দিন এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল

ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক সুফল পাওয়া যায়। এটিকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন অতি দ্রুত নানা কাজ করা যায়, তেমনি অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা যায়। এর ব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে সুফল পাওয়া যায় তার কিছু দৃষ্টান্ত হচ্ছে:

- ফ্রিল্যান্সিং, www.odesk.com, www.freelancer.com সাইটগুলোতে একাউন্ট খুলে।
- ওয়েব ডিজাইন-এর মাধ্যমে।
- গ্রাফিক্স ডিজাইন। যেমন ব্যানার, বুক কভার, ভিজিটিং কার্ড, বিভিন্ন প্রোডাক্ট ডিজাইন, পোস্টার ইত্যাদি ডিজাইন তৈরি করে।
- ব্লগিং বা আর্টিকেল তৈরি করে। (অনলাইনে লিখিত আর্টিকেলকে ব্লগ বলা হয়।)[১৪]
- ই-মেইল মার্কেটিং এর মাধ্যমে। (এটি এক ধরনের ই-মেইলের মাধ্যমে এডভার্টাইজিংয়ের কাজ।)
- SEO (সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন) এর মাধ্যমে।
- অনলাইনে বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা, অ্যাপস তৈরি, অ্যানড্রোয়েট অ্যাপস, মোবাইল অ্যাপস, সফটওয়্যার ও প্রোগ্রাম তৈরি করার মাধ্যমে।
- পিটিসি সাইটে শুধু মাত্র ক্লিক করে টাকা আয় করা যায়। ইন্টারনেটে অর্থ আয়ের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল পিটিসি (Paid to Click) এর কাজ।
- অনলাইন সার্ভে করে আয় করা যায়।[১৫]

---

১৪. http://www.monthlyattawheed.com/online-identity-and-contact/#sthash.r6HWTfi6.dpuf. ২০ মার্চ, ২০১৫

- মতামত প্রকাশ করে আয় করা। এরকম একটি সাইট হল- সোস্যালস্পার্ক।
- বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে আয় করা যায়।
- টুইটারে আয় করা যায়। এর একটি ভালো সাইট হল, মেগ-এ-পাই।[১৬]

এছাড়া যোগাযোগ, হিসাব সংরক্ষণ, গবেষণা, দাওয়াতী কাজ ইত্যাদিতে এর ব্যবহারের দ্বারা অনেক সুফল পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার চমৎকার মাধ্যম এ ইন্টারনেট। আর ইন্টারনেটের প্রতি দিন দিন মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দা'ওয়াতী মাধ্যমে খরচ অনেক কম। এর মাধ্যমে কাজ করা অনেক সহজ। একবার পোস্ট করলে দীর্ঘ মেয়াদী দা'ওয়াতের প্রচার চলতে থাকে। মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয় না। ব্যাপক অঙ্গনজুড়ে একে কাজে লাগানো যায়।[১৭]

ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও এর কুফল

প্রযুক্তি মানুষকে জ্ঞানের আলো দেখায়; আবার মানুষের পশুবৃত্তির কারণে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে সমাজ ও রাষ্ট্রের। ইন্টারনেট যেমন কাউকে বিশাল জ্ঞানের রাজ্যের সন্ধান দিতে পারে, তেমনি দিতে পারে বিশাল খারাপ একটি রাজ্যের সন্ধানও। পৃথিবীর সকল আবিষ্কারের লক্ষ্যই মানবকল্যাণ, কিন্তু মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে এসব আবিষ্কারকে খারাপ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে। জানা যায়, 'নিউক্লিয়ার'[১৮] আবিষ্কৃত হয়েছিল মানবকল্যাণে; ব্যবহৃত হয়েছে মানব ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে। বর্তমান তথ্যের রাজ্যে বাধাহীন, অবাধ বিচরণের প্রধান মাধ্যম ইন্টারনেট হওয়ায় এটি এখন সর্বাধিক আলোচিত ও ব্যাপক সমালোচিত। এর প্রধান কারণ হল ইন্টারনেটের বাধাহীন ও শাসনহীন অবাধ ব্যবহার। ফলে সমাজ জীবনে বয়ে নিয়ে আসছে বিপজ্জনক সব ভাইরাস, বয়ে নিয়ে আসছে অপসংস্কৃতি, অশ্লীল, উলঙ্গ ও বিকৃত ছবি, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কিছু।[১৯]

আদি থেকে আজ পর্যন্ত যৌনতা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে ধারণা করা হয়। ইন্টারনেট এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ২০০৬ সালে সারাবিশ্বে পর্নো ইন্ডাস্ট্রির

---

১৫. www.surveybouty.com www.paidsurveysonline.com, ২০ মার্চ, ২০১৫

১৬. www.surveybouty.com www.paidsurveysonline.com, ২০ মার্চ, ২০১৫

১৭. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০৩, পৃ. ৩০১

১৮. নিউক্লিয়ার হচ্ছে, পারমানবিক বিভাজনের দ্বারা প্রাপ্ত শক্তি। [দ্রঃ *বাংলা একাডেমী ইংলিশ-বাংলা অভিধান*, ২৫তম সংস্করণ, মে ২০০৪, পৃ. ৫১৬।]

১৯. মোঃ বেলায়েত হোসেন, *সেলফোন ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার রুখতে হবে*, ২৪ জুন ২০১২ http://black-iz.com/wp/2012/06/24/A8#sthash.IWLdsb4e.dpuf, ২০ মার্চ, ২০১৫

সম্মিলিত আয় ছিল ৯৭.০৬ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ছিল ১৩ বিলিয়ন ডলার। এই আয় গুগল, অ্যামাজান, ইবে, ইয়াহু, অ্যাপল ও নেটফ্লিক্সের সম্মিলিত আয়ের চেয়ে বেশি। N2H2 দ্বারা ২০১৩ সালে পরিচালিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটগুলোর সংখ্যা সারাবিশ্বে সর্বমোট ছিল ১.৩ মিলিয়ন, পেজের সংখ্যা ছিল ২৬০ মিলিয়ন। প্রতি সেকেন্ডে ৩,০৭৫.৬৪ ইউএস ডলার পর্নোগ্রাফিতে খরচ করা হয়। প্রতি সেকেন্ডে ২৮,২৫৮ জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী পর্নোগ্রাফি দেখেন। প্রতি সপ্তাহে ২০,০০০-এর বেশি অপ্রাপ্তবয়স্কদের পর্নোগ্রাফিক ছবি ইন্টারনেটে পোস্ট করা হয়।[২০]

প্রবাদে আছে, حُبُّكَ الشيءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ-'কোন বস্তুর ভালবাসা তাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।'[২১] মানুষ যখন কোন বস্তুকে ভালবাসে এবং তার ভালবাসা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার দোষ-ত্রুটি ও ক্ষতির দিক ভুলে যায়, তাতে কোন বিপদ বা অকল্যাণ খুঁজে পায় না, যদিও সেখানে অনেক দোষ-ত্রুটি, বিপদ ও অকল্যাণ থাকে। অনেকেই আছেন যারা ইন্টারনেটকে বৈধ প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। কিন্তু আধুনিক যুগে যুবক ও যুবতীদের মাঝে ইন্টারনেট প্রীতি, গভীর মনোনিবেশ সহকারে এর যথেচ্ছ ব্যবহার, কোন প্রকার ক্লান্তি অথবা বিরক্তবোধ ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে ইন্টারনেটের সামনে বসে থাকা এমনি একটি বিষয় যা সামাজিক ও চারিত্রিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসংখ্য যুবক-যুবতী রয়েছে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে উলঙ্গ ছবি দেখার জন্য, অশ্লীল দৃশ্যসমূহ উপভোগ করার জন্য এবং অবৈধ ওয়েবসাইটসমূহ খোঁজার জন্য, যা একজন যুবককে পাশবিক শক্তিতে বন্দি করে ও দুর্বল করে ফেলে। ফলে তাকে ফলদায়ক উপকারী যে কোন কাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাকে সংকীর্ণ গণ্ডীতে আটকে রেখে তাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে।

ড. সুলাইমান আল-কুদরী বলেন, 'এ অশ্লীল ছবিসমূহ যুবক-যুবতীদের মানসিক ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা এ ছবিসমূহ তার মনে ও ব্রেইনে সারাক্ষণ ঘুরপাক খেতে থাকে, ফলে তা দেখা তার বদ অভ্যাসে পরিণত হয়।'[২২] নিম্নে দু'টি কেসস্টাডি তুলে ধরা হলো।

---

২০. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 10/8/2003 [http://tech.priyo.com/blog/2011/10/18/364.html, Tuesday, October 18, 2011 - 7:05am], ২০ মার্চ, ২০১৫

২১. আলী হাসান তৈয়ব, ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ : রিয়াদ, সৌদিআরব, জুন ১৮, ২০১১, পৃ. ৩। শর্ট লিংক: http://IslamHouse.com/353683, ২০ মার্চ, ২০১৫

২২. ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, *আমাদের যুবসমাজ ও ইন্টারনেট*, www.islamhouse.com, ২০ মার্চ, ২০১৫

কেস স্টাডি-১: নিলয় (ছদ্ম নাম), রাজধানীর নামি-দামী স্কুলের ৮ম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্র। একদিন প্রবাসী বড় ভাইয়ের নিকট ল্যাপটপের জন্য বায়না ধরে। শুরুতে রাজি না হলেও পরবর্তীতে মা-বাবার কথামতো বড় ভাই একটি ল্যাপটপ পাঠায়। এতেই পাল্টে যায় তার জীবন। একাকী থাকা তার খুব পছন্দ। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরেও দমফাটা গরমে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে। সারাক্ষণ কেমন যেন অস্থির, চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। শিক্ষক জানায়, নিলয়ের পড়ালেখায় অমনযোগিতার সাথে যুক্ত হয়েছে ক্লাস ফাঁকি দেয়া। মা-বাবা খোঁজ নিয়ে ভয়ংকর তথ্য জানতে পারে, নিলয় আগের মত নেই, তার রুম বন্ধ করে সারাক্ষণ বাজে ছবি দেখে, ফেসবুকে চ্যাট করে সময় নষ্ট করে। এতেই তার রেজাল্ট খারাপ হয়। মা-বাবা তার কাছ থেকে ল্যাপটপটি সরিয়ে রাখে। এতেও সে থামেনি, এখন সে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সাথে যুক্ত হয়েছে মাদকাসক্তি।[২৩]

কেস স্টাডি-২: রনি (ছদ্ম নাম), একজন স্বনামধন্য ব্যাংক অফিসারের ছেলে। এস এস সি-তে এ প্লাস পেয়ে পাশ করে। এরপর রাজধানীর একটি নামকরা কলেজে ভর্তি হয়। ইতঃপূর্বে ভালো রেজাল্টের জন্য বাবার কাছ থেকে জেদ ধরে একটি মাল্টিমিডিয়া ট্যাবলয়েড ফোনসেট কিনে নেয়। এতেই তার জীবনে নেমে আসে চরম অবনতি। সারাক্ষণ ইন্টারনেটে ডুবে থাকে। তার এইচ এস সি আর পাশ করা হলো না।

৩১ জুলাই ২০১২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার পাতায় 'শাস্তি না হওয়ায় বাড়ছে যৌন অপরাধ' শিরোনামে লেখা হয় '... কিছু ছাত্র-ছাত্রী বলছে, তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্নো ছবি সন্ধান করে এং পর্নো ওয়েবসাইটগুলোতে যায়। এদের অনেকে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে পেনড্রাইভে ছবি নিয়ে এসে বাসায় লুকিয়ে কম্পিউটারে দেখে।'[২৪]

এক পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণে দেখা যায়:

- ইন্টারনেটে আড্ডায় নিমজ্জিত ৮০% যুবক পরবর্তীতে বিয়ে করে না।
- এদের ৭০% নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াত করে এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
- এদের ৫৫% তাদের পরিবারের কোন খোঁজখবর নেয় না।
- এরা সারাদিন ফেসবুক, টুইটারে রুচিহীন মন্তব্য আদান-প্রদান করে, এদের অধিকাংশই খারাপ ওয়েবসাইটসমূহের ঠিকানা বিনিময় করে, এমনকি তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহেও। ফলে এটি শিক্ষা কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত

---

২৩. আমাদের ইন্টারনেটের ভালো মন্দ, *দৈনিক সংগ্রাম*, সম্পাদকীয় পাতা, ২১ এপ্রিল, ২০১৫

২৪. *মাসিক আল কাউছার*, সেপ্টেম্বর, ২০১২; *দৈনিক মানবকণ্ঠ*, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

করে। তাদের কেউ কেউ লেখা-পড়ায় অগ্রগামী থেকেও আস্তে আস্তে পশ্চাদগামী হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইভটিজিং, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, গুম, হত্যাসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।[২৫]

- অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে দেখাশুনা না করার ফলে সন্তানরা মা-বাবার সাথে মিশতে ভয় পায়।[২৬] এর ফলে পারিবারিক বন্ধন থেকে তারা শিথিল হয়ে পড়ে।[২৭]
- অবৈধ পন্থায় অবাধ জীবন যাপনে এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এরা মনে করে যৌনতাই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য যদি বিবাহ ছাড়াই পূরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে বিবাহের আর প্রয়োজন কি! এভাবে অল্প বয়সেই তাদের নৈতিক স্খলন ঘটছে। বেছে নেয় তারা মাদক ও অপরাধের পথ।[২৮]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজির অধ্যাপক, স্নায়ুবিজ্ঞানী ও রয়াল ইনস্টিটিউশন অব গ্রেট ব্রিটেন-এর পরিচালক সুসান গ্রিনফিল্ড বলেন,

> আমার ভয় হচ্ছে, এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাইটগুলো আমাদের মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় ছোট শিশুদের সমপর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট শিশুরা যেমন কোন শব্দ বা উজ্জ্বল বাতি দেখে আকৃষ্ট হয়, এখানকার মানুষজনও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নোটিফিকেশন দেখে আকৃষ্ট হয়, তাদের দিনের একটা বড় অংশ এই সাইটগুলোতে ব্যয় করে।[২৯]

বিশেষজ্ঞদের মতে, অনলাইন নেটওয়ার্কিং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে আর অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়িয়ে দেয় ক্যান্সারের ঝুঁকি। মানুষ যতই ইন্টারনেট আসক্ত হয়ে পড়ছে ততই তারা পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে মানুষের মাঝে বিষণ্নতা ও একাকিত্ব বাড়ছে। তাই বলা যায় বর্তমান প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কুফল থেকে বাঁচার উপায়

প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া যারা অহেতুক ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি নিয়ে সময় ব্যয় করে, ফলহীন কোন কথা বা কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের স্মরণ করতে হবে শুধু এ উদ্দেশ্যেই

---

২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ৮

২৬. *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

২৭. http://womenexpress.net/shopnokotha/information-and--technology, ৪ জানুয়ারী, ২০১৫

২৮. ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, *আমাদের যুবসমাজ ও ইন্টারনেট*, www.islamhouse.com, ২০ মার্চ, ২০১৫

২৯. http://www.priyo.com/2013/10/23/37063.html, ৩ মে, ২০১৫

আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন নি। একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না, আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা সর্বদায় তাকে স্মরণ রাখতে হবে। এমন বিনোদনে মেতে থাকা যাবে না যার কোন বাস্তবতা নেই, কোন উপকারিতা নেই। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

আর এক শ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে (তাদের নিতান্ত) অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং তারা একে ঠাট্টা-বিদ্রূপ হিসেবেই গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।[৩০]

তাকে জানতে হবে যে বিষয়ে সে সময় ব্যয় করছে তার কি লাভ বা ক্ষতি। যে বিষয়ে জানা নেই এমন আল্লাহর অবাধ্য কোন কাজে সে নিজেকে ঠেলে দিতে পারে না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভালো কাজে ব্যস্ত থাকা, তথ্য অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা প্রভৃতিতে ক্ষতি বা দোষের কিছু নেই; কিন্তু এটিকে ব্যবহার করে কেউ যাতে নৈতিক ও মানসিক কোন ক্ষতির স্বীকার না হয়, সে জন্য একজন সচেতন মুসলিম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেভাবে এর ক্ষতিকর দিকথেকে বেঁচে থাকতে পারে তার কিছু উপায় তুলে ধরা হলো:

১. **তাকওয়ার অনুশীলন ও পারস্পরিক সহযোগিতা :** এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমার সকল কর্মকাণ্ড দেখছেন। কিয়ামতের দিন নিজের লজ্জাজনক ও অশ্লীল কাজসমূহের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

সে দিন তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টিই তাদের পরিবেষ্টন করে নিবে যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াত।[৩১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে আসমান ও যমীনে কোন কিছুই গোপন নেই।[৩২]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾

---

৩০. আল-কুরআন, ৩১ : ৬
৩১. আল-কুরআন, ৪৫ : ৩৩
৩২. আল-কুরআন, ৩ : ৫

আর তোমরা তাকওয়া ও ভালো কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো; আর তোমরা সীমালংঘন ও গুনাহের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।[৩৩]

সংকর্মে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِله

যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছাওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত।[৩৪]

২. **দৃষ্টির হিফাজত :** দৃষ্টির হিফাজত বলতে দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর অন্তর্ভুক্ত।[৩৫] ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

হে নবী, তুমি মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হিফাযত করে; এটিই হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম পন্থা; তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন। আর মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হিফাযত করে; আর যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।[৩৬]

৩. **শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে সাবধান :** শয়তান সবসময় চায় মানুষকে ক্ষতি করতে। তাই সে অশ্লীল ও মন্দ কাজে মানুষকে আহ্বান করে। এক্ষেত্রে ইউসূফ আ.-এর দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যুলায়খার কুপ্ররোচণা এবং শয়তানের পথ থেকে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, (সে যেন জেনে রাখে), সে (অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ দেবে।[৩৭]

---

৩৩. আল-কুরআন, ৫ : ২

৩৪. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-'ইলম, পরিচ্ছেদ : আদ-দাল্লু 'আলাল খাইর .., হাদীস নং- ২৬৭০। শায়খ আলবানী রাহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

৩৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মাআরেফুল কুরআন*, পৃ. ৯৩৮

৩৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১

৩৭. আল-কুরআন, ২৪ : ২১

প্রবৃত্তির তাড়নায় সাময়িক পদস্খলন ঘটার উপক্রম হওয়ার সাথে সাথে একজন মুসলিমের অন্তঃকরণ প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে তার অসর্তকতার ঘোর ভেঙ্গে দিবে। সে অনুতপ্ত হবে। ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কান্নাকাটি করবে।[৩৮] এরপর সে সতর্ক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾

যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।[৩৯]

৪. **পরিণতির কথা ভাবা :** পাপ কাজ করার পূর্বে এ কথা চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার যাবতীয় কাজ দেখছেন এবং পরকালে এর জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

আজকের দিনে আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দিব আর তাদের হাতসমূহ আমার সাথে কথা বলবে এবং তা যা করেছে সে ব্যাপারে তাদের পাসমূহ সাক্ষ্য দিবে।[৪০]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

পড় তোমার কিতাব। আজকের দিনে হিসাব গ্রহণে তুমি নিজেই যথেষ্ট।[৪১]

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এক পা অতিক্রম করতে পারবে না। তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন পথে তা কাটিয়েছে? কোন পথে যৌবন অতিবাহিত করেছে? তার সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে? কোন পথে সে সম্পদ ব্যয় করেছে? যা জেনেছে তা কতটুকু আমল করেছে?[৪২]

---

[৩৮]. ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী, *আদর্শ মুসলিম*, অনুবাদ : মাসউদুর রহমান নূর, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২৫

[৩৯]. আল-কুরআন, ৭ : ২০১

[৪০]. আল-কুরআন, ৩৬ : ৬৫

[৪১]. আল-কুরআন, ১৭ : ১৪

[৪২]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : কিয়ামাহ, হাদীস নং-২৪১৬

৫. **প্রবৃত্তির উদ্দীপক বিষয় থেকে দূরে থাকাঃ** যে সমস্ত কাজ, কথা, ও আচরণ প্রবৃত্তিতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তা থেকে দূরে থাকতে হবে। বিষয়টি এমন যে, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া তো দূরে থাক, তার কাছেও যাওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অশ্লীলতার নিকটবর্তীও হয়ো না।[৪৩]

৬. **প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা :** আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখে তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত।[৪৪]

৭. **যৌন আবেদনময় সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা :** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾

আর যারা যখন খারাপ কাজ করে অথবা নিজেদের উপর যুলম করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের কৃত পাপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৪৫]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

আর ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হবে না, নিশ্চয় এটি পাপাচার এবং নিকৃষ্ট পথ।[৪৬]

৮. **চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া :** রাসূলুল্লাহ স. মানুষের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ

নিশ্চয় আমি মহান চরিত্রসমূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।[৪৭]

৯. **গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দেয়া :** আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

আর তোমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে নিয়োজিত হয়ো না; নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর এ সবকিছুকে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৪৮]

---

৪৩. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

৪৪. আল-কুরআন, ৭৯ : ৪০ - ৪১

৪৫. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৫

৪৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৪৭. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, পরিচ্ছেদ : মাকারিমুল আখলাক, ১০/৩২৩; হাদীস নং- ২০৭৮২

৪৮. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

১০. **ইসলামী মিডিয়ার ভিত্তিসমূহ অনুসরণ করাঃ** এ ভিত্তিগুলো হচ্ছে- ঈমান, ইসলামী জ্ঞান, নৈতিকতা, মানবিকতা, সামাজিকতা[৪৯], সত্যবাদিতা, সংবাদ সংগ্রহে সত্যের উপর অবিচল থাকা[৫০], সময় ও পরিবেশ বিবেচনায় আনা, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিকে মূল্যায়ন করা প্রভৃতি।[৫১]

ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য উল্লিখিত আয়াত, হাদীস ও বিষয়াবলির প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পাশপাশি সরকার, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থাসমূহ, অভিভাবক, শিক্ষক, আলিম সমাজ, লেখক, প্রকাশক, খতীব, সমাজের দায়িত্বশীল ব্যাক্তিত্বদের ভূমিকা রাখতে হবে। ইন্টারনেটের অপব্যবহারের হাত থেকে এ সমস্ত ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ যেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তা হচ্ছেঃ

সরকারের দায়িত্ব

- ইন্টারনেটে যে সমস্ত ক্ষতিকর ও নৈতিকতা বিরোধী ওয়েবসাইট, ওয়েব লিংক ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোকে বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করে বা সেন্সরশিপের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা।
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার যাতে সহজলভ্য না হয় তার ব্যবস্থা করা এবং নৈতিকতাহীন ও অশ্লীল ওয়েবসাইটসমূহ বন্ধ করা।
- বিশেষ এলাকা বা অঞ্চল ভাগ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করে অপব্যবহারকারীদের সনাক্ত করা, নজরদারী বাড়ানো ও তাদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি আইনকে আরো শক্তিশালী করা।
- বেকারত্ব দূর করা।

আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থাসমূহের দায়িত্ব

- আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থা[৫২] অশ্লীল ওয়েবসাইট ও ওয়েব লিংকসমূহ বন্ধ করতে পারে।
- মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে মুসলিম আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ওআইসি, আরবলীগ প্রভৃতি সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

---

৪৯. মুহাম্মদ করম সুলায়মান, *আত-তারীখুল ই'লামী ফী দুয়িল ইসলাম*, মানসূরাহ : দারুল ওয়াফা, ১৪০৯ হি., পৃ. ৩২

৫০. ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, দামেশক : মাকতাবাতুল গাযালী, তা.বি., পৃ. ৪৪

৫১. ড. সাঈদ ইবন আলী ইবন সাবিত, *আল উসূলুল ফিকরিয়্যা লিল ই'লাম*, রিয়াদ : দারুল ফজিলাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮হি., পৃ. ১৬৭

৫২. যেমনঃ গুগল, ইয়াহো, অপেরামিনি ইত্যাদি

- এ জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করে তা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

অভিভাবকের দায়িত্ব

- সন্তানের প্রথম শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে তার অভিভাবকের গৃহ। তার মা-বাবাই হচ্ছে প্রথম শিক্ষক ও অভিভাবক। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানকে যেভাবে শিক্ষা দিবে তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে। সন্তান বড় হওয়ার সময় মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট যাতে তাদের হাতের নাগালে না থাকে সে ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা হাতে না দেয়া।
- যৌবনে পদার্পণের সময় তারা কোথায় যায়, কেমন বন্ধুরসাথে চলাফেরা করে তা লক্ষ্য রাখা।
- পরিণত বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেয়া ইত্যাদি।

আলিম সমাজের দায়িত্ব

- বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে আলিম সমাজ ইসলামের ব্যাপক অবদান রাখতে পারেন। বিশেষকরে মাদ্রাসার প্রধান কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ মাদ্রাসার স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট করে সেখানে সব তথ্য রাখতে পারেন। মাদ্রাসায় পড়া কেন প্রয়োজন, এতে দেশ ও মানবতার কীরূপ সেবা হয়, এ ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাতে থাকতে পারে।
- মাদ্রাসার সকল শিক্ষককে প্রতি মাসে অথবা দুই মাসে ন্যূনতম একটি করে ছোট গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে বলা হবে। সেগুলো দায়িত্বশীল কারো সম্পাদনার পর ইন্টারনেটে মাদ্রাসার ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়া।
- ছাত্ররা যে দেয়ালিকা প্রকাশ করে তা ওয়েবসাইটে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম, সিলেবাস, বার্ষিক মাহফিল ইত্যাদি সবকিছু ওয়েবসাইটে দেয়া ও তা নিয়মিত আপডেট দিতে হবে।
- আলেমদের নিয়মিত বক্তব্য-আলোচনাগুলো ওয়েবসাইটে দেয়া। ওয়েবসাইটে প্রশ্ন করার অপশন থাকবে যেন পাঠক বা ভিজিটর সহজেই প্রশ্ন করতে পারেন এবং যে কোন বিষয়ে ইসলামী সঠিক সমাধান পেতে পারেন।

লেখকদের দায়িত্ব

- নিজের লিখিত প্রবন্ধ, যেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো ব্যক্তিগত সাইটে প্রকাশ করা।

- ছোট স্মৃতি, অনুভূতি, দৈনন্দিন ডায়েরী বা অপ্রকাশিত ইসলামী লেখাগুলো সাইটে দেয়া।
- প্রকাশিত বইগুলোর ভূমিকা, সূচি, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি সাইটে দেয়া।
- মন্তব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে পাঠক-ভিজিটরদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে।

ইসলামী বই প্রকাশকদের দায়িত্ব

- প্রকাশনার একটি নিজস্ব সাইট থাকতে পারে। সেখানে প্রকাশিত সব বই এর প্রচ্ছদ, ভূমিকা, সূচি, মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা।
- নতুন নতুন বইয়ের সংবাদ ও রিভিউ প্রকাশ করা যেতে পারে। ই-কমার্সের মাধ্যমে সহজেই বই বিক্রয় করা যেতে পারে।

মসজিদের খতীবদের দায়িত্ব

- নিজের নামে ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট খুলতে পারেন। সেখানে নিজের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ওয়াজ-নসিহত, জুমু'আর বয়ান ইত্যাদির অডিও-ভিডিও রাখা যেতে পারে।
- দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর নানা ইসলামী দিক তুলে ধলে ব্লগ লিখতে পারেন। পাঠক যেন প্রশ্ন করতে পারেন, সে অপশনও রাখতে পারেন।

সমাজের দায়িত্বশীল ব্যাক্তিদের দায়িত্ব

- সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সমাজকে সুস্থধারায় পরিচালনার জন্য তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।
- নিজ নিজ এলাকাভিত্তিক খেলা-ধূলাসহ সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারে।

এছড়া আরো যেভাবে দায়িত্ব পালন করা যায়

- ইসলামী পত্রিকা চালু করা। সেটি দৈনিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক হতে পারে।
- সোশ্যাল কমিউনিটি সাইট, ব্লগ ও ফোরামের মাধ্যমে: যেমন- ফেসবুকে বেশি বেশি ইসলামী গ্রুপ খুলে বন্ধু-বান্ধবকে আহ্বান করা ও ইসলামী স্ট্যাটাস দেয়া।
- কুরআনের আয়াত, হাদীস বা স্কলারদের উক্তি স্ট্যাটাসে দেয়া এবং ইসলামী সাইট, আর্টিকেল, অডিও ও ভিডিও লিংক বেশি করে শেয়ার করা।
- ইসলামী সাইটের ফ্যান পেজ খুলে বন্ধু-বান্ধবসহ অন্যদেরক আহ্বান করা এবং ইসলামী নোট লিখে ট্যাগ করা।
- ই-মেইল গ্রুপ, গুগল গ্রুপস, ইয়াহু গ্রুপস-এ ইসলামী গ্রুপ খুলে ইসলামী আর্টিকেল পাঠানো।

- র‍্যাংকিং ভালো এমন সাইটে ইসলামী সাইটের প্রচার করা। ব্লগার ডট কম, ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়ার্ডপ্রেস ইত্যাদি সাইটে যতবেশি সম্ভব ব্লগ লিখে বা লিংক শেয়ার করে ইসলামী সাইটের প্রচার করা।
- বেশি ব্যবহৃত হয় এমন বুকমার্ক টুলে ইসলামী সাইট বুকমার্ক করা।
- রিডার/ফীড ইত্যাদিতে সাবস্ক্রাইব করা। গুগল রিডার, ফীডবার্ণার ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী সাইটের আর.এস.এস ফীডে সাবস্ক্রাইব করা। এসব টুল দিয়ে সাবস্ক্রাইব করা হলে অন্য ভিজিটরের কাছেও তা উপস্থাপিত হয়।
- ইসলামী মাহফিল, সেমিনার বা আলোচনা সভার সরাসরি সম্প্রচার ও অডিও আপেলোড করা। এক্ষেত্রে 'পলটক' বা 'ইউস্ট্রীম' ভালো সহযোগিতা করতে পারে।
- সফটওয়্যার অথবা ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন নির্মাণের মাধ্যমে।
- প্রচলিত পন্থায় ই-মেইলের মাধ্যমে।
- ব্যক্তিগত সাইটের লোকদের ভুল শুধরে দেয়ার মাধ্যমে।
- শক্তিশালী ওয়েবসাইট নির্মাণ করা। ইসলামী সাইটের স্বত্বাধিকারীদের সাথে ইসলামের দাওয়াতে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে নিজস্ব কিছু ওয়েবসাইট বানানো। যেমন: সৌদি আরবভিত্তিক ওয়েবসাইট- www.islamhouse.com, www.assunnah.com. এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় অমুসলিম, নও মুসলিম ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য প্রচুর পরিমাণ আর্টিকেল সমৃদ্ধ সাইট রয়েছে। বাংলায় এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই এমন একটি শক্তিশালী সাইটের খুব প্রয়োজন, যাতে মানুষ মুসলমান হওয়ার পূর্বে ও পরে প্রাথমিক স্টেজে ও সাধারণ মুসলিম হিসেবে যে সকল সন্দেহ ও সমস্যায় পতিত হয়, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

সুপারিশমালা

প্রত্যেক মুসলিমকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনে যত সময় ব্যয় হয় কিয়ামতের দিন এ সময়গুলোর হিসাব দিতে হবে। তাই ইন্টারনেটের অপব্যবহার নয়; বরং এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সন্তান-সন্ততিসহ সকলেই কিভাবে এর দ্বারা সুফল পেতে পারে তার কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

- বৈধ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- পরিবারের সাথে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আরো বেশী সময় দেয়া।[৫৩]

---

৫৩. ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী, *আদর্শ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

- নিজের প্রকৃত দুঃখ-কষ্ট সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। বিশেষকরে নিজের সমস্যাগুলো নিজের মাঝে গুটিয়ে না রেখে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে আলোচনা করা।
- ড্রাগ, এলকোহলের প্রতি আসক্তি বা অন্য কোন মানসিক সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করা।
- ভালো মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
- অসামাজিক, আত্মকেন্দ্রিক ও ঘরকুনো স্বভাব থাকলে তা পরিবর্তন করা। প্রয়োজনে মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া এবং চিকিৎসা নেয়া।
- ধীরে ধীরে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় ও গুরুত্ব কমিয়ে আনা।
- নতুন ইসলামী সাইটের ঠিকানা এবং এর শরয়ী বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রচার করা। এক্ষেত্রে নতুন সাইটের নতুন নতুন বিষয়গুলো পুরো লিংকসহ প্রচার করা।
- নবাগত ভালো লেখকদের মন্তব্য জানিয়ে উৎসাহ প্রদান করা।
- চলমান ইস্যুগুলো সংশ্লিষ্ট ফিকহী দিকগুলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।
- মানুষকে বিদ'আত, নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে সতর্ক করা।
- নির্দিষ্ট কোন হারাম কাজ নির্মূলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তা নির্মূলের চেষ্টা করা।
- জনকল্যাণমূলক কাজে মানুষকে পথ দেখানো।
- বিপদগ্রস্ত মানুষের আশু সাহায্যের আবেদন প্রচার করা।
- মানুষকে সুসংবাদ পৌছে দেয়া।
- মিথ্যা খণ্ডন করা এবং ইসলামের অপপ্রচারের জবাব দেয়া।
- দাওয়াতী কাজে সহযোগিতার আবেদন প্রচার করা।
- বিভিন্ন উপলক্ষে সমৃদ্ধ কোন ইসলামী সাইটের বিভিন্ন কনটেন্ট (বিষয়সূচি) প্রচার করা। যেমন হজ্জের ও রমজান মাসে সংশ্লিষ্ট বিষয় সাইটে তুলে ধরা। বিশেষ করে যে ইবাদত সামনে আসছে মানুষকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন লায়লাতুল কদরের গুরুত্ব, আশুরার সাওম ইত্যাদি।
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধে আইসিটি ও তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার

ইন্টারনেট নামক মিডিয়া যদি শুধু ন্যায় ও সুন্দরের পথ দেখাতো, অন্যায় ও অশ্লীলতা পরিহার করতো, তাহলে এখান থেকে মানবজাতি আরো বেশি উপকৃত হতো। আসলে এটিই কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীরা অনেক সময় অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে থাকে। প্রতিটি মিডিয়া ফুলের মত, যার মধ্যে মধু ও বিষ উভয়টিই রয়েছে। মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে; মাকড়সা বা এ জাতীয় কীটপতঙ্গ এখান থেকে বিষ সংগ্রহ করে। এটি আবার ধারালো ছুরির ন্যায়। এটিকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় সেভাবেই কাজ করে। এ জন্য বলা যায়, মিডিয়া একটি নিরপেক্ষ ও নিরীহ বস্তু। এমতাবস্থায় শুধু ইন্টারনেট নামক মিডিয়াকে গালাগালি, দোষারোপ করা ঠিক হবে না। এ জন্য সুস্থ ধারার ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর ব্যবহারকারীকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সরকারকে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে অন্যায় ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, ইন্টারনেট অনলাইনের যেমন দশটি ভালো দিক রয়েছে, ঠিক তেমনি খারাপ দিকও রয়েছে যা একটি দশটির সমতুল্য। তবে কেবল বিনোদন হিসেবে না নিয়ে এবং অপব্যবহার করে অহেতুক সময় নষ্ট না করে বরং ক্যারিয়ার গঠন, তথ্য সংগ্রহ কিংবা অধিক জানার আগ্রহ নিয়ে এটিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলে এর দ্বারা মুসলমানরা অনেক সুফল পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ** : *সমাজের একক হচ্ছে পরিবার। সমাজের অস্তিত্বের জন্য সুষ্ঠু-সুন্দর ও অপরাধমুক্ত পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। অথচ বিভিন্ন কারণে পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের হার ক্রমশ বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা ও আইনসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে পরিবারের পরিচয়, অপরাধের পরিচয়, পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহ, সংঘটিত অপরাধসমূহের কারণ, এসব অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের কারণসমূহ, অপরাধ যেন না ঘটে সে ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা জানা যাবে। গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।*]

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া আ. এর মাধ্যমে যে পরিবার ব্যবস্থার উৎপত্তি হাজার হাজার বছর পরেও তা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ, বস্তুবাদী জীবনধারা চর্চার অসুস্থ প্রবণতা, বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বহুমুখী আগ্রাসন, অপসংস্কৃতি ও ধর্মবিচ্যুতির প্রবণতার দ্রুত বিকাশমানতা, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, আদর্শহীন রাজনীতি ও সমাজনীতির বিস্তার, যে কোন মূল্যে ক্ষমতা দখল ও অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কারণে ও বহুবিধ নেতিবাচক উপাদানের উপস্থিতির ফলে পারিবারিক জীবনব্যবস্থা আজ হুমকির মুখে। অথচ ইসলাম মানুষের পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার যাবতীয় ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণনা করে দিয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় পারিবারিক জীবনে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেহেতু পারিবারিক জীবন ছাড়া মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য, তাই বৃহত্তর স্বার্থে ও লক্ষ্যে ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অপরাধ মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন পারিবারিক জীবন হুমকি মুক্ত হয়ে শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল হবে, অপরদিকে সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব হবে নিরাপদ ও সৌহার্দ্যময়।

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

পরিবার-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থে পরিবার বলতে পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পোষ্যবর্গ, একান্নবর্তী সংসার, পত্নী ইত্যাদি বুঝায়।[১] ইংরেজিতে পরিবারের প্রতিশব্দ হলো Family[২], আরবীতে আহল (اهل), 'আয়িলা (عائلة), উসরা (أسرة) শব্দাবলি দ্বারা পরিবার বুঝায়।[৩] উল্লেখ্য যে, আরবী শব্দ উসরাহ (أسرة) আসরুন (أسر) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ শক্তি। মানুষ তার আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম ব্যক্তিবর্গ সমেত পরিবারের দ্বারা শক্তিশালী হয় বলে এ নামকরণ করা হয়েছে।[৪] আল-কুরআনুল কারীমে উসরাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। আমাদের জানা মতে, ফকীহগণ তাঁদের কিতাবদিতেও এ শব্দটি ব্যবহার করেননি। তবে বর্তমানে কোন ব্যক্তির পোষ্যবর্গ যেমন স্ত্রীসহ উর্ধ্বতন ও অধস্তন সদস্যগণকে বুঝাতে উসরাহ শব্দটি প্রয়োগ হচ্ছে। অতীতকালে ফকীহগণ পরিবার বুঝাতে আল (آل), আহল (اهل) ও ইয়াল (عيال) শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন।[৫] আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসেও পরিবার বুঝাতে উপরোক্ত তিনটি শব্দই ব্যবহার হয়েছে।[৬]

পরিভাষায় পরিবার বলতে সাধারণত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়। আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ-তে পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, পরিবার হলো কোন ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও তার ঘরের লোকজন।[৭] সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ-এ পরিবার-এর পরিচয় লেখা হয়েছে এভাবে,

> পরিবার বলতে বুঝায় স্বামী-স্ত্রীর এমন একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংখ্যা, যেখানে সন্তান সন্ততি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। বস্তুত পরিবার হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে বসবাস

---

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ব্যাবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃ. ৭২৬

২. Sir Subhar Bhattacharya (Revised By) *Samsad Bengali- English Dictionary* (Third Edition), Kolkata : Sahiya Samsad, 2002, p, 508

৩. আবু তাহের মেসবাহ সম্পাদিত, *আল-মানার*, ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০, পৃ. ৮৫৪

৪. *আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ (ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ), ইসলামের পারিবারিক আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫৩

৫. প্রাগুক্ত

৬. নূরুল ইসলাম, *ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৭

৭. *আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত

করে। ব্যাপক অর্থে মাতা-পিতা, সন্তান সন্ততি, নিকট রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় এবং দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী নিয়েই হচ্ছে পরিবার।[৮]

"আল-ফিকহুল মানহাজী" গ্রন্থে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে।[৯]

অপরাধ-এর পরিচয়

অপরাধ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দোষ-ত্রুটি, আইন-বিরুদ্ধ কাজ, দণ্ডনীয় কর্ম, পাপ, অধর্ম ইত্যাদি।[১০] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Crime, Offence, Fault, Defect, Sin, Guilt ইত্যাদি।[১১] অপরাধ বুঝাতে আরবীতে যানবুন (ذنب), জারীমাহ (جريمة), জিনায়াহ (جناية), খাতীআহ (خطيئة), ইছমুন (إثم) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।[১২]

পরিভাষায় সাধারণভাবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বা কোন সমাজে প্রচলিত লিখিত আইন বা প্রথাকে অমান্য বা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ বলা হয়। সাধারণ অর্থে আইনত দণ্ডনীয় বা নিষিদ্ধ কাজই অপরাধ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মবিরোধী কোন কথা বা কাজই অপরাধ। অপরাধবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্নভাবে অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ-এ অপরাধ এর পরিচয়ে লেখা হয়েছে,

সমাজ স্বীকৃত পথ ব্যতীত অন্য পথে চলা, আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বেআইনী কাজ করাই অপরাধ। অর্থাৎ সরকার বা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এমন কাজ করা অপরাধ।[১৩]

বিখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী [৩৬৪-৪৫৫ হি.] রহ. অপরাধ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

ইসলামী শরীয়াতে অপরাধ হলো শরঈ দৃষ্টিতে বর্জনীয় ঐ সকল কর্মকাণ্ড, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হদ্দ বা তাযীর দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন।[১৪]

---

৮. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১১৬
৯. ড. মুসতাফা আল-খিন ও ড. মুসতাফা আল-বুগা, *আল-ফিকহুল মানহাজী*, দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯৬ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১৬
১০. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১১. Sir Subhar Bhattacharya, *Samsad Bengali- English Dictionary*, ibid, p. 53
১২. আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১৩. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৪. আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ ওয়াল বিলায়াতুদ দ্বীনিয়্যাহ*, মিশর : মুস্তফা আলবাবী আল-হালাভী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ. ১৮২

প্রখ্যাত আইনবিদ আব্দুল কাদের আওদাহ অপরাধ-এর সংজ্ঞায় বলেন,

الجريمة بأنها: إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون

অপরাধ হলো আইনত নিষিদ্ধ- এরূপ কোনো কাজ সম্পাদন করা অথবা আইনত পালনীয়- এরূপ কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা।[১৫]

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহ

পারিবারিক জীবনে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় সেগুলো মৌলিকভাবে সাধারণ অপরাধ থেকে ভিন্ন নয়। তবে কারণগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে কিছুটা ভিন্ন। পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এর সংখ্যা খুব বেশি নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হত্যাকাণ্ড কিংবা শারীরিকভাবে আহত করার মধ্যেই এই অপরাধগুলো সীমাবদ্ধ থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মানসিক ভাবে নির্যাতন করা হয়, যা কারো কারো ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো ছাড়াও গুম করা, ভয়ভীতি দেখানো ইত্যাদি অপরাধও সংঘটিত হয়। নিম্নে অপরাধসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো খুন, খুনের হুমকি বা চেষ্টা, লাঞ্ছিতকরণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন[১৬] ধর্ষণ ও ধর্ষণ-চেষ্টা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা, যৌনবৃত্তিতে বাধ্য করা, যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, যৌন নির্যাতন, মনস্তাত্তিক / আবেগজনিত বা মানসিক নির্যাতন, অযৌক্তিক লিঙ্গ বৈষম্য, খোটা দেয়া, অপবাদ দেয়া, যৌতুক আদায়, কম খেতে দেয়া, অকথ্য গালিগালাজ, মাত্রাতিরিক্ত ঘাটানো, গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া, অন্যায়ভাবে তালাক দেয়া, আত্মীয়-

---

১৫. আব্দুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী'উল জিনায়ী আল-ইসলামী মুকারানান বিল কানূনিল ওযঈ*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১ হি., খ. ১, পৃ. ৬৭-৬৮

১৬. দুর্বলের উপর শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে আহত করাকে শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়ে ফেলা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী কোন মারাত্মক অস্ত্রের সাহায্যে কাউকে আঘাত করা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে শরীরে দাকুনি দেয়া, ধাক্কা দেয়া, শ্বাসরোধ করা, কামড়ানো, পোড়ানো, গালি দেয়া ও প্রহার করার মাধ্যমে কাউকে অসুস্থ করে ফেলাই শারীরিক নির্যাতন। তাছাড়া কিল ঘুষি মারা, চুল টেনে ধরা, থাপ্পর দেয়া, হাত মুচড়ানো, দেয়াল বা শক্ত কিছুর উপর শরীর চেপে ধরা, শক্ত কোন বস্ত্র শরীরের দিকে ছুঁড়ে মারা ইত্যাদি বিষয়গুলো শারীরিক নির্যাতনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দ্র. মোঃ গোলাম আজম ও মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান সরকার, স্ত্রীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব : অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, চতুবিংশতিতম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৩, পৃ. ৯৭

স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখতে না দেয়া, ভরণ-পোষণের খরচ না দেয়া, যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, হিল্লা বিয়েতে বাধ্য করা, বৈষম্যমূলক গর্ভপাত, বাধ্যতামূলক গর্ভপাত ইত্যাদি।[১৭]

উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ছাড়াও বহু ধরনের অপরাধ পারিবারিক জীবনে সংঘটিত হয়। যেগুলো দণ্ডবিধিতে বা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত হয়নি। তাই এই অপরাধগুলো অনেক ক্ষেত্রেই মামলাযোগ্য বা আদালতে বিচারযোগ্য নয়।

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের কারণ

যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার পিছনে কোন না কোন কারণ অবশ্যই থাকে। সেসব কারণ উদঘাটন ব্যতীত সমাধানের পথে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। তাই সম্প্রতি দ্রুত ক্রমবর্ধমান পারিবারিক জীবনে অপরাধ দমনের উপায় বের করার পূর্বে এর কারণগুলো কী কী তা জানা আবশ্যক। সাধারণ যেকোন অপরাধের কারণ এবং পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের কারণ সবসময় এক হয় না। যদিও অপরাধের ধরন ও পদ্ধতি প্রায় একই হয়। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য যেহেতু পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা ও আইনসমূহের ভূমিকা জানা, সেহেতু সর্বপ্রথম পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত অপরাধগুলো কেন ঘটছে, এর পিছনে কী কী কারণ রয়েছে তা জানা জরুরী। তাই সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করে কিছু কারণ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. পরকীয় প্রেম

অনুসন্ধানে দেখা গেছে পারিবারিক অপরাধের মধ্যে হত্যাকাণ্ড, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ইত্যাদির পেছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে পরকীয় প্রেমের সম্পর্ক। পরকীয় প্রেম বলতে সাধারণত নিজের স্বামী বা স্ত্রী বাদে অন্যের স্বামী বা স্ত্রীর কিংবা অন্য কারো সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা। এক্ষেত্রে দুইপক্ষই বিবাহিত হতে পারে কিংবা একপক্ষ বিবাহিত আর অপরপক্ষ অবিবাহিত হতে পারে। পরকীয় প্রেমকে দেশীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ ও অনৈতিক মনে করা হলেও এটি এখন আর গোপন কিছু নয়। বিভিন্ন কারণে পরকীয় সম্পর্কের হার ক্রমশ বর্ধমান। আগে শুধু শহরে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও এখন তা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পরকীয় প্রেমের কারণে কোন একপক্ষ কর্তৃক তার অবৈধ কর্মের বাধা হিসেবে আবির্ভূত ব্যক্তিকে হত্যা করা বা করানোর প্রবণতা দৃশ্যমান। কখনো স্বামী তার স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী তার স্বামীকে হত্যা করে। সাথে সন্তান থাকলে তারাও হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায় না। পরকীয় প্রেম এতো শক্তিশালী যে, এর সামনে যেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেই হত্যাকাণ্ড কিংবা অন্য কোন অপরাধের শিকার হতে পারে।

---

১৭. *নারীর প্রতি সহিংসতা নির্যাতন ও যৌন হয়রানি নির্মূলে ব্রাক*, ঢাকা : জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি (জি জে এন্ড ডি) সেকশন, ব্রাক, ২০১০, পৃ. ১১

গত ৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ঢাকায় মিরপুরে ব্যাংক কর্মকর্তা এক স্বামীর পরকীয়ার বলি হয়েছে তার স্ত্রী ও সাত বছরের শিশুপুত্র।[১৮] এভাবে প্রায়শই পারিবারিক হত্যাকাণ্ড ঘটছে পরকীয় প্রেমের কারণে। পরকীয় প্রেম যেন এক মূর্তিমান আতঙ্ক। এটি একদিকে যেমন বাধাদানকারী নিকটাত্মীয়কে হত্যা করতে উৎসাহিত করে, অপর দিকে পরিবার ও সমাজকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। তাই পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে পরকীয় প্রেমকে দায়ী করা যায়। উল্লেখ্য যে, পরকীয় প্রেমে জড়িয়ে পরারও পেছনেও কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো পরবর্তী আলোচনায় ওঠে আসবে।

২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়

পশুর সাথে মানুষের যে কয়টি বিষয়ে পার্থক্য দৃশ্যমান সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা। পশুর জীবনাচারে নৈতিকতার বালাই নেই বলে তাদের মূল্যবোধও নেই। তা নিয়ে কেউ প্রশ্নও তোলে না। কারণ তাদের নৈতিকতাহীন জীবনাচার সমাজজীবনে কোন প্রভাব ফেলেনা। কিন্তু মানুষের নীতি নৈতিকতাহীনতা ও মূল্যবোধহীনতা মানবসমাজকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে জোর গলায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা বলা হলেও তার চর্চা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুপস্থিত। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এখন শুধু পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ। দেশের জনগণের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ব্যক্তির পরিবার বা সমাজের দায়িত্বকে অস্বীকার না করেই বলা যায়, রাষ্ট্র যেভাবে তার নাগরিকদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে পারে অন্য কেউ তা সেভাবে পারে না।

বাংলাদেশের জনগণ এতটা নৈতিকতাহীন পূর্বে কখনো ছিলনা যতটা আজ দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আগমন দেশের যুবসমাজের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে সর্বনাশ ডেকে আনছে। আজকাল পারিবারিক জীবনে সে অপরাধসমূহ দেখা যাচ্ছে যেগুলোর অনেকাংশের পিছনে ব্যক্তির নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাবকে বিশেষজ্ঞগণ দায়ী করছেন। কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীর প্রেম, পরকীয় প্রেম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, যথাযথ নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ছায়ায় গড়ে ওঠা কোন ব্যক্তি এরূপ অপরাধ ঘটাতে পারে না। তাই পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের পিছনে নীতি-নৈতিকতার অনুপস্থিতি ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় অনেকাংশেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

---

১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর, ২০১৪

৩. যৌতুক

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের পিছনের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই যৌতুকের কারণে স্বামী বা স্বামীর বাড়ির লোকজন স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। নির্যাতনের মাত্রাগত ভিন্নতা থাকলেও প্রায়শই দেখা যায়, স্ত্রীকে আঘাত করা হয়। তাতে তার কোন না কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপপরিষদ হতে প্রকাশিত এক পর্যালোচনা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শুধু ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৪৬৫৪ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হন ৪৩১ জন। যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ২৩৬ জনকে।[১৯] এ সংখ্যা শুধু জনসমক্ষে বা পত্রিকায় আসা নির্যাতনের একটি চিত্র। তাই যৌতুককে পারিবারিক অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৪. জমি-জমা ভাগ-বণ্টন

ওয়ারিছ সূত্রে প্রাপ্ত জমির ভাগ-বণ্টনকেন্দ্রিক ঝগড়া পারিবারিক অপরাধের একটি বড় কারণ। সাধারণত দেখা যায়, পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির বণ্টন ও দখল পাওয়াকে কেন্দ্র করে ভাই-ভাই কিংবা চাচা-ভাতিজা অথবা পরিবারের অন্য কারো মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। যা পর্যায়াক্রমে মারামারি থেকে খুনোখুনি পর্যন্ত পৌঁছায়। প্রায়শই পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, জমি বণ্টনকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন। পার্থিব সম্পদের প্রতি অতিমাত্রার মোহ আপন ভাইকে হত্যা করতেও বাধা দেয় না। দেশের নিম্ন আদালতে এবং উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার একটি বড় অংশই হচ্ছে জমি-জমা কেন্দ্রিক মামলা। পরবর্তীতে মামলাকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বংশানুক্রমিক ভাবে এসব মামলা চলতে থাকে। ফলে জমিতো কেউ ভোগ করতেই পারে না, উপরন্তু মামলার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

৫. মানসিক বিষণ্নতা

মন ও দেহের যৌথ সুস্থতার ওপর ব্যক্তির সার্বিক জীবনাচার নির্ভর করে। ব্যক্তির মানসিক বিষণ্নতা তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে শুধু ব্যাহতই করে না, বরং তা তাকে অনেক ক্ষেত্রে হিংস্র করে তোলে। তাই মানসিক বিষণ্নতাকে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ অপরাধের কারণ হিসেবে মনে করেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেছেন, যৌথ পরিবার ভেঙে বস্তুতান্ত্রিক নগরব্যবস্থায় একক পরিবারের একাকিত্বে মানুষ বিষণ্ন হয়ে পড়ছে। ফলে বাড়ছে পারিবারিক কলহ। ধীরে ধীরে তা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে

---

১৯. www.prothom-alo.com/bangladesh/article/413116/ Date : 12.05.2015

নৃশংসতায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Social Welfare Research এর অধ্যাপক রবিউল ইসলাম বলেন,

> সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা আমাদের একাকী করে দিচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। মানুষ যখন মানসিকভাবে বিষণ্ন হয়ে পড়ে, তখন সে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যে কোন অপরাধে যুক্ত হতে পারে।[২০]

৬. অপসংস্কৃতি

মানবজীবন আনন্দময় ও উপভোগ্য করার ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃতির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। দেশ-কাল-ধর্ম ভেদে সংস্কৃতির বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। বাংলাদেশে অনুসৃত দেশজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতি যথেষ্ট মার্জিত ও পরিশীলিত। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দেশজ সংস্কৃতি বা অন্য ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে দেশের নব্বই শতাংশ জনগোষ্ঠীর ইসলাম ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে পার্থক্য ও বিরোধিতা দেখা যায়। গত কয়েক দশক যাবৎ স্যাটেলাইট মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশী, বিশেষ করে ভারতীয় ও পশ্চিমা সংস্কৃতি এদেশে অবাধে প্রবেশ করেছে এবং সর্বস্তরের জনগণের দেশীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার করছে। যার ফলে দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণ-যুবকরা সংস্কৃতি চর্চার নামে অপসংস্কৃতিতে ঢুবে যাচ্ছে।

বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচারিত নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল ইত্যাদির মাধ্যমে অপসংস্কৃতির বীজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব মাধ্যমে অবৈধ প্রেম, পরকীয় প্রেম, বউ-শাশুড়ির যুদ্ধ, দেবর-ভাবীর অবৈধ ঘনিষ্ঠতাসহ নানাবিধ নষ্ট, ভ্রষ্ট ও অশ্লীল অপসংস্কৃতি মুসলিম সমাজে ঢুকে পারিবারিক ও সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে কোণঠাসা করে ফেলছে। বিভিন্ন নাটক, সিনেমা ও সিরিয়ালে আসক্ত আজকের যুব ও নারী সমাজ এসব দেখে সেগুলোকে নিজেদের জীবনাচার হিসেবে গ্রহণ করছে। এসব অপসংস্কৃতির কু-প্রভাবে পরিবার পর্যন্ত ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাই পারিবারিক অপরাধ ক্রমশ যে বাড়ছে তার পিছনে অপসংস্কৃতিও একটি বড় ভূমিকা পালন করছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৭. পারিবারিক অনুশাসন না থাকা

পরিবার হলো মানবশিশুর প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে মা-বাবা ও অন্যান্য সদস্যের অনুশাসনে শিশুরা বড় হয়। শিশু-কিশোররা এই বয়সে যথাযথ পারিবারিক অনুশাসনে না থাকলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। বর্তমান পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থা অবহেলিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তাই তাদের সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করে আমাদের সমাজেও পরিবার ব্যবস্থা হুমকির মুখে

---

২০. http://somoynews.tv/pages/print_news Date : 10.05.2015

পড়েছে।[২১] ফলে পারিবারিক অনুশাসন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারে ছোটবেলা থেকে অনুশাসনের মধ্যে বড় না হলে সন্তান অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এদের দ্বারাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারিবারিক অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই পরিবারের অভ্যন্তরে পারিবারিক অনুশাসন না থাকাও পারিবারিক অপরাধের অন্তর্নিহিত কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

৮. পারিবারিক/দাম্পত্য কোন্দল

পরিবারের এক সদস্যের সাথে অপর কোন সদস্যের ভুল বোঝাবুঝি কোন কারণে ঝগড়া বিবাদ কিংবা রাগারাগি কখনো কখনো অপরাধ সংঘটনের দিকে নিয়ে যায়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কোন্দল অনেক ক্ষেত্রে এক পক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে হত্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না। কখনো এই কোন্দল ভাই-বোন কিংবা ভাই-ভাই এর মধ্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত কোন্দলের, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর কোন্দলের কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দাম্পত্য কোন্দলের পেছনে সাধারণত যৌতুক, পরকীয়া প্রেম, অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়া, পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করা, পর্দা ব্যবস্থা না মানা, একই পরিবারে বিপরীত সংস্কৃতির অনুসরণ, পারিবারিক বৈষম্য, আত্মীয়-স্বজনের সাথে বিরোধ ইত্যাদি কারণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

৯. আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব ও বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতা

বাংলাদেশে পারিবারিক অপরাধ দমনে বা প্রতিরোধে একাধিক বিশেষ ও সাধারণ আইন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ২০১০ সালে প্রণীত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন অন্যতম।[২২] তাছাড়া দণ্ডবিধি সহ অন্যান্য আইনেও পারিবারিক অপরাধের বিচার করা সম্ভব। কিন্তু আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ খুব কমই হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ভুক্তভোগীরা আইনের আশ্রয় নেন না। পারিবারিক সম্মান বিনষ্টের আশঙ্কায় অনেকে আইনের শরণাপন্ন হতে দেন না। ফলে পারিবারিক অপরাধগুলোর যথাযথ বিচার হয় না। আর বিচার না হওয়া বা দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা উৎসাহিত হয়। কিংবা অপরাধ করে তারা পার পেয়ে যায়। যা তাদেরকে পরবর্তীতে আরো অপরাধ করতে উৎসাহিত করে।

১০. সমাজ পরিবর্তনের অসুস্থ ধারা

সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজভুক্ত মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজও পরিবর্তন হয়। কিন্তু সমাজ যদি সঠিক ও সুস্থ

---

২১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, শাহাদাৎ হুসাইন খান, হুকমির মুখে পরিবার ব্যবস্থা, *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ জুলাই, ২০১০, পৃ. ৯

২২. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1063, 15.05.2015

ধারায় পরিবর্তিন না হয়ে অসুস্থ ধারায় পরিবর্তিত হয়, তাহলে এর কুপ্রভাব পরিবারের ওপর পড়তে বাধ্য। সমাজের সদস্যদের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য, তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার, চাহিদা বৃদ্ধি, বস্তুতান্ত্রিকতা, বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণকে আধুনিকতা মনে করা, মাদক ইত্যাদি উপসর্গের উপদ্রব এতটাই বেড়ে গেছে যে, সমাজ পরিবর্তনের ধারার নিয়ন্ত্রণ এখন আর কারো হাতে নেই। অসুস্থ ধারায় সমাজ পরিবর্তনের ফলে পরিবারের সদস্যরা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে ঘটছে পারিবারিক অপরাধ।

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে দেশীয় আইন ব্যবস্থায় একাধিক আইন থাকলেও বিভিন্ন কারণে সেগুলোর সুফল সমাজে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় পারিবারিক জীবনে অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ম মানবজীবনে শৃঙ্খলা ও মুল্যবোধ নিয়ে আসে। আর ধর্মহীন জীবনকে শুধু ধর্মীয় অনুশাসনহীন আইন দিয়ে শৃঙ্খলায় আনা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন কারণে ধর্মীয় আইন ব্যক্তির জীবনে যতুটকু প্রভাব ফেলে অন্য কোন আইন তা পারে না। তাই বলা যায় যে, পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহ দমন বা নির্মূল করতে হলে ইসলামী আইনের শরণাপন্ন হতে হবে। চরম বিশৃঙ্খল তৎকালীন আরব ও বিশ্বসমাজকে কুরআন ও হাদীসের আইন দ্বারা যেভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সভ্য করা সম্ভব হয়েছে বিশ্বে তার বিকল্প নযীর নেই। অত্র অনুচ্ছেদে ইসলামী আইন বলতে ইসলামী আইনের প্রধান দু'টি উৎস কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা ও বিধি-বিধান, নৈতিক ও আইনি দিকসমূহ তুলে ধরা হবে।

১. পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়া যেহেতু পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের অন্যতম প্রধান কারণ, সেহেতু এ ধরনের অপরাধ দমনে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার কোন বিকল্প নেই। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন তথা পরিবারের সকল সদস্যের আন্তঃসম্পর্ক জোরদার করতে হবে। এ বন্ধনকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। নির্দেশনাসমূহ কুরআন-সুন্নাহর দলীলসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

০১. স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট থাকা

স্ত্রী হচ্ছে জীবনে প্রাপ্ত সকল সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ। একজন সৎকর্মশীলা স্ত্রী পরিবারের রানী হিসেবে রাজ্য-সদৃশ পরিবারকে সংরক্ষণ করেন। স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্টি পারিবারিক অশান্তি ডেকে আনে এবং পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

> সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই সম্পদ আর দুনিয়ার সকল সম্পদের মধ্যে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎকর্মশীলা নারী।[২৩]

স্ত্রী যদি কখনো এমন কাজ করে ফেলে, যা স্বামীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তাহলে স্বামীর উচিত হবে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তার অন্য ভালো গুণের কথা চিন্তা করা। এক্ষেত্রে একজন মুমিনের করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

> কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে। কারণ সে ঐ নারীর একটি বিষয়কে অপছন্দ করলেও অন্য কোন একটি গুণকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে।[২৪]

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। শরী'আহ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হলে কথায় কথায় স্ত্রীর ওপর অসন্তোষ প্রকাশ রাসূলুল্লাহ স.-এর আদর্শবিরোধী। সাধারণত তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হতেন না। স্ত্রীর প্রতি অসন্তোষ যেহেতু পারিবারিক অপরাধের পথকে উন্মুক্ত করে, সেহেতু প্রত্যেক স্বামীর উচিত স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। উল্লেখ্য যে, একই নির্দেশনা বিপরীতক্রমেও প্রযোজ্য।

০২. স্ত্রীর অধিকার প্রদান

পারিবারিক সহিংসতা দমনে স্ত্রীর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেমন অধিকার রয়েছে, স্বামীর ওপরও স্ত্রীর তেমন অধিকার রয়েছে। স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- স্ত্রীর মাহর (মোহর) তাকে পূর্ণরূপে দিয়ে দেয়া। এ প্রসঙ্গে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য মাহর সানন্দচিত্তে দিয়ে দাও।[২৫]

তাছাড়া পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া, ভরণপোষণ পাওয়াসহ কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত প্রাপ্য অধিকারসমূহ স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। সাধ্য থাকা

---

[২৩] ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ১১, পৃ. ১২৭, হাদীস নং-৬৫৬৭; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুন নাসাঈ*, হাদীস নং-৩২৩২

[২৪] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আর-রাদা', পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াসিয়্যাহ বিন-নিসা, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং- ৩৭২১

[২৫] আল-কুরআন, ০৪ : ০৪

সত্ত্বেও স্ত্রীর শরী'আহ প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রদান না করলে বা করতে ব্যর্থ হলে স্বামীকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২৬]

পারিবারিক ক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধসমূহের মধ্যে যৌতুক ও যৌতুকজনিত অপরাধসমূহ দমনে স্ত্রীর অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যেমন স্বামীর কাজ থেকে তার অধিকার বুঝে নিবে, একইভাবে স্বামীকেও তার অধিকার বুঝিয়ে দেবে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার প্রদান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে এবং পারিবারিক অপরাধ হ্রাস পাবে।

০৩. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতন করার কোন অনুমতি তো ইসলাম প্রদান করেইনি, বরং ইসলাম স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

استَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।[২৭]

আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করা।[২৮]

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। যা পালন করা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ফরজ। স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি কখনো তার স্ত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেননি, কটু কথা বলেননি; শারীরিকভাবে আঘাত করাতো অনেক দূরের কথা। তিনি সকল স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের দৃষ্টিতে উত্তম হতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৮৯৩

২৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আর-রাদা', পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াসিয়্যাহ বিন-নিসা, প্রাগুক্ত, তা.বি., হাদীস নং-৩৭২০

২৮. আল-কুরআন, ৪ : ১৯

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীর নিকট উত্তম।[২৯]

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক যে, সে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. এর অনুসরণ করবে। তাই পারিবারিক জীবনে রাসূলুল্লাহ স.-এর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসরণ করলে স্ত্রীকে নির্যাতন করার তো কোন সুযোগ নেই, উপরন্তু তার সাথে ভালো ব্যবহার করা আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৪. সন্তানকে যথাযথভাবে বিয়ে দেওয়া

বিয়ে মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিয়ের মাধ্যমেই বৈধভাবে একজন পুরুষ ও একজন নারী একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবারের সূচনা করে। পারিবারিক জীবনে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় তার মূলে রয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। ইসলামী আইনানুযায়ী সন্তানকে সুশিক্ষিত করে বিয়ে দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, ছেলেকে বিয়ে দেয়ার সময় বা ছেলে নিজে বিয়ে করার সময় তার স্ত্রী হিসেবে অবশ্যই যথাযথভাবে দীন অনুসরণকারী মেয়েকে নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা হলো, মেয়ের বংশমর্যাদা, সম্পদ, সৌন্দর্যের চেয়ে তার দীনদারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যান্য সকল গুণ পাওয়া গেলেও যে মেয়ের মধ্যে ন্যূনতম দীনদারী নেই তাকে পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করা যাবেনা। মেয়ের দীনদারীকে অগ্রাধিকার দেয়ার আদেশ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

চারটি গুণ দেখে সাধারণত মেয়েদের বিয়ে করা হয়। এ গুণ চারটি হলো- তার ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য ও দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদার মহিলাকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তোমার দু হাত ধুলায় ধুসরিত হবে। অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩০]

এই হাদীস স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে, ছেলেকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মেয়ের অন্যান্য গুণ থাকুক বা না থাকুক; দীনদারী অবশ্যই থাকতে হবে। আর আমাদের সমাজের মেয়ের দীনদারীকে অগ্রাধিকার দেয়া তো দূরের কথা; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য গুণকে

---

[২৯]. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-মানাকিব, পরিচ্ছেদ : ফাযলু আযওয়াজিন নাবিয়্যি স., বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ৩৮৯৫। হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৩০]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল-ইকতিফা-উ বিদ্দীন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৮০২

অগ্রাধিকার দেয়া হয়; দীনদারীকে মনে করা হয় গৌণ বিষয়। ফলে স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহভীতি থাকে না। এরকম স্ত্রীর মাধ্যমে ভালো কিছু আশা করা দুষ্কর। তবে আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন তার কথা ভিন্ন। দীনদারীহীন মেয়েকে বিয়ে করলে সেই ঘরে শয়তানের পদচারণা ও প্ররোচনা বেশি থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তাই পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের সূতিকাগার স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যথায় পারিবারিক জীবনে নেমে আসতে পারে মহাবিপর্যয়।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম শুধু ছেলেকে বিয়ে দেয়ার সময় মেয়ের দীনদারী দেখতে বলেছে তা-ই নয়; মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সময় মেয়ের অভিভাবককে ছেলের দীনদারীও দেখে বিয়ে দিতে বলেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

তোমাদের নিকট যদি এমন কারো বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দীনদারী ও চরিত্র সন্তোষজনক, তাহলে তার নিকট মেয়েকে বিবাহ দাও। অন্যথায় যমীনে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।[৩১]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাত্র-পাত্রীর কোন একটি নির্বাচনে ভুল করলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি, কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, নির্যাতনসহ অসংখ্য পারিবারিক অপরাধ জন্ম নেওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রত্যেকের উচিত, দীনদার পাত্র-পাত্রী বিবাহ করা বা পাত্র-পাত্রীর দীনদারী দেখে বিবাহ দেয়া। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনার অনুসরণ করলে মতভেদ কম হবে। ফলে পারিবারিক অশান্তিও কম হবে। তাছাড়া সকল পারিবারিক সমস্যার সমাধানে তারা উভয়েই কুরআন-সুন্নাহর শরণাপন্ন হবেন। ফলে ব্যক্তির চেয়ে পরিবার, পরিবারের চেয়ে দীনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করবেন।

০৫. সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করা

দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার ক্রমশ বাড়ছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরাধ। অথচ শিক্ষা মানুষকে সভ্য, মার্জিত ও বিনয়ী করে। তাহলে কি যে শিক্ষা মানুষকে সৎ করে সে শিক্ষা নেই নাকি শিক্ষার উপাদানে ভেজাল রয়েছে? পর্যালোচনায় দেখা যায়, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন সুশিক্ষা না থাকায় মানুষ শিক্ষিত হয়েও বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মশিক্ষাকে গৌণ

---

৩১. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ইযা জাআকুম মান তারযাওনা দীনাহু ফা যাওয়্যিজূহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৮৪। হাদীসটির সনদ হাসান।

করে দেশের শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, যাতে নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নৈতিকতার পিতৃভূমি ধর্মকে সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধর্মহীন নৈতিকতা মানুষকে সাময়িকভাবে নৈতিক জীব বানালেও যেহেতু জবাবদিহিতার কোন বিষয় এখানে নেই সেহেতু চূড়ান্ত অর্থে তা ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল ও অপরাধমুক্ত বানাতে পারে না।

ব্যক্তির মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের মানবীয় মর্যাদা ও অধিকারকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার শিক্ষা দেয় একমাত্র ইসলাম। তাই পারিবারিক অপরাধসহ মানবজীবনে সংঘটিত সকল অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে একমাত্র ইসলামী শিক্ষা। ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণী "পড়"।[৩২] আর পড়াই হলো শিক্ষার প্রধানতম মাধ্যম। তাছাড়া জ্ঞান অন্বেষণকে ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ (আবশ্যক) করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।[৩৩]

এই হাদীসে যে কোন জ্ঞান অর্জনকেই ফরয করা হয়নি; বরং যে জ্ঞান ব্যক্তিকে সত্যিকারের মানুষ ও মুসলিম বানায় সে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম পিতা-মাতার ওপর দায়িত্বারোপ করেছে যে, সন্তানকে কুরআন-সুন্নাহর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। আর শিক্ষার দাবী হচ্ছে, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। তাহলে ইসলামী শিক্ষা কখনো পারিবারিক অপরাধকে অনুমোদন দেয় না। বরং তা সর্বাত্মকভাবে নিষেধ করে এবং প্রতিহত করে।

০৬. মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করা

মা-বাবার হলেন পরিবারের মূল। তাদের মাধ্যমেই সন্তান পৃথিবীতে আসে এবং তারাই তাদের জীবনের সবটুকু দিয়ে সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। তাই পারিবারিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে মা-বাবার অধিকার। সন্তানের নিকট মা-বাবার যেসব অধিকার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সদাচরণ পাওয়ার অধিকার। পারিবারিক বন্ধনকে

---

৩২. আল-কুরআন, ৯৬ : ০১

৩৩. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : ইফতিতাহুল কিতাব ফিল ঈমান ওয়া ফাযাইলিস সাহাবা ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাযলুল উলামা ওয়াল হাছু আলা তলাবিল ইলমি, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৮১; হাদীস নং-২২৪। হাদীসটির উদ্ধৃত অংশটুকুর সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ*, হাদীস নং-২২৪

সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। মা-বাবার প্রতি সদাচরণ না করলে পারিবারিক অপরাধ হ্রাস পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই কুরআনে একাধিকবার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআয়ালা বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾

আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছি।[৩৪]

এছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মাতা-পিতার প্রতি ইহসান প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।[৩৫] বিশেষ করে সূরা আল-ইসরা-তে আল্লাহ তা'আলা বৃদ্ধ মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদের 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।[৩৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. দ্বিতীয় যে কাজটির কথা বলেছেন সেটি হলো, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা।[৩৭] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) এর পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হিসেবে মাতা-পিতার অবাধ্য আচরণ বা অবাধ্যাচরণকে

---

৩৪. আল-কুরআন, ২৯ : ০৮

৩৫. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫-১৬, ৩১ : ১৪; ০৪ : ৩৬

৩৬. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪

৩৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তাওহীদ, পরিচ্ছেদ : ওয়া সাম্মান নাবিয়্যু স. আস-সলাতা 'আমালান..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭০৯৬

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

উল্লেখ করেছেন।[৩৮] অন্য হাদীসে মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না বলে ঘোষণা হয়েছে।[৩৯]

মাতা-পিতার সাথে অসদাচরণ করলে বা তাদের অবাধ্য হলে দুনিয়াই আল্লাহ ঐ সব সন্তানদের শাস্তি দেন মর্মে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

> كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللهُ تَعَالَى مَا شَاءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ
>
> সকল গুনাহর শাস্তিই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত করেন শুধু মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের শাস্তি ছাড়া। এই গুনাহ যে করবে আল্লাহ তার শাস্তি এই দুনিয়াতেই তার মৃত্যুর পূর্বে দিয়ে দেন।[৪০]

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম মাতা-পিতার অধিকারের বিষয়ে খুবই শক্ত আইন জারি করেছে। কোন মাতা-পিতা যদি তার অধিকার না পায় তাহলে আইনের আশ্রয় নিতে পারে কিংবা রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে সন্তানকে বাধ্য করবে তার মাতা-পিতার প্রতি ইহসান করতে এবং তাদের ভরণ-পোষণ দিতে। তাই তো দেখা যায়, সম্প্রতি বাংলাদেশে "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৪" নামে একটি আইনও জারি করা হয়েছে।[৪১] মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান দুনিয়াতেই তার শাস্তি ভোগ করবে বলে হাদীসে যে বর্ণনা এসেছে তাতে অনুমান করা যায়, ঐ সন্তান কোন অপরাধ কর্মে জড়িত হয়ে শাস্তি পেতে পারে। আর এ ধরনের সন্তানরাই

---

৩৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, পরিচ্ছেদ : মা কীলা ফী শাহাদাতিয যূর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫১০

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

৩৯. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান,* তাহকীক : আবুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'তা, হালব : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি., হাদীস নং- ২৫৬২। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى »

৪০. ইমাম আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহায়ন,* তাহকীক : মুসতাফা আব্দুল কাদির 'আতা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি., হাদীস নং- ৭২৬৩; হাদীসটির সনদে বাকার ইবনু আব্দুল আযীয রয়েছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

৪১. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1132, ১৫.০৫.২০১৫

পারিবারিক অপরাধ বেশি ঘটায়। তাই মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে, অপরদিকে পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের হারও ক্রমশ হ্রাস পাবে।

০৭. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা

পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে সর্বত্রই বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ না করলে পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না। তখন কেউ কারো কথা, আদেশ-নিষেধ শুনতে বা মানতে চায় না। ফলে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অপকর্ম করে ফেলে। বড়রা তাকে নিষেধ করলে সে তা মানে না। পরিবারের বড়রা বিশেষ করে বড় ভাই বা বোনেরা যদি ছোট ভাই-বোনদের স্নেহ করে এবং ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে তাহলে অনেক পারিবারিক সমস্যা; যেগুলো পরবর্তীতে সহিংসতায় রূপ নেয় সেগুলো সমাধান হয়ে যায়। এ জন্যে ইসলাম ছোটদের স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৪২]

এই হাদীস মেনে পরিবারের বড়রা যদি ছোটদের স্নেহ এবং ছোটরা যদি বড়দের শ্রদ্ধা করতো, তাহলে পারিবারিক বন্ধন ও দৃঢ় হতো এবং অপরাধও অনেকটা কমে যেতো।

০৮. হালাল উপার্জনের দ্বারা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা

ইসলামী আইনের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো হালাল-হারাম। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়াবলির কিছু হালাল আর কিছু হারাম। একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য আবশ্যক যে, সে হালালকে গ্রহণ করবে এবং হারামকে বর্জন করবে। পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য উপার্জন করতে হয়। যেই উপার্জন করুন না কেন তাকে অবশ্যই হালাল পথে হালাল অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে হবে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছ-বিচার করা না করার ওপর পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ

ঐ শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছে।[৪৩]

---

৪২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রহমাহ, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ৪৯৪৫; হাদীসটির সনদ সহীহ, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-৪৯৪৩

৪৩. ইমাম আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : হুসাইন সালীম আসাদ, দামেশ্‌ক : দারুল মামূন লিত্-তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি., হাদীস নং-৮৩-৮৪; হুসাইন সালীম আসাদ

তাই ইসলাম প্রত্যেকের জন্য হালাল উপার্জনকে ফরজ বলে আখ্যয়িত করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

সকল ফরজের পরে হালাল উপার্জনের অনুসন্ধান করাও ফরজ।[৪৪]

উপর্যুক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতে যেতে হলে হালাল উপার্জন করতে হবে। যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে নিজে খায় এবং পরিবারকে খাওয়ায় তার বা তাদের শরীর জাহান্নামের জন্য তৈরি হচ্ছে। আর যে দেহ জাহান্নামের জন্য তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে ভালো অন্তর আশা করা যায় না। আর অন্তরই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় খারাপ অন্তর ব্যক্তিকে খারাপ ও অপরাধমূলক কাজে উৎসাহিত ও তৃপ্ত করবে, আর অন্যদিকে ভালো অন্তর ব্যক্তিকে ভালো ও গঠনমূলক কাজে উৎসাহিত ও তৃপ্ত করবে। রাসূল স. অন্তরের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন,

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

জেনে রাখ! দেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। যেটি সুস্থ থাকলে সমস্ত দেহে সুস্থ থাকে আর সেটি অসুস্থ থাকলে সমস্ত দেহ অসুস্থ থাকে। সেটি হচ্ছে অন্তর।[৪৫]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ব্যক্তির আচরণে তার খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র ও উপার্জনের প্রভাব থাকে। তাই পারিবারিক বন্ধন শক্ত করতে এবং অপরাধ কমাতে হালাল উপার্জনের কোন বিকল্প নেই।

০৯. পর্দার বিধান বাস্তবায়ন করা

পারিবারিক অপরাধ সংঘটনের পরোক্ষ কারণ হিসেবে পর্দা ব্যবস্থা মেনে না চলা অন্যতম। এই ব্যবস্থা মেনে চললে পরকীয়া থেকে শুরু করে পারিবারিক অপরাধের অনেক প্রত্যক্ষ কারণই দেখা যেতো না। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ও পরিবারের বাইরে প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য পর্দা ব্যবস্থা মেনে চলা আবশ্যক। পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার প্রতি আদেশ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

হাদীসটির সনদ যঈফ বললেও মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী এটির সনদকে সহীহ বলেছেন; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ,* রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-২৬০৯

৪৪. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি., হাদীস নং- ১২০৩০; হাদীসটির সনদ যঈফ, মুহাম্মাদ আত-তিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* তাহকীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., খ. ২ , পৃ. ১২৮, হাদীস নং- ২৭৮১

৪৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : ফাযলু মানিসতাবরা-আ লি-দীনিহী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {} وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৪৬]

উক্ত আয়াত দুটি ছাড়াও আল-কুরআনে একাধিক আয়াত ও হাদীসের গ্রন্থাবলিতে অসংখ্য হাদীস রয়েছে যেগুলোতে পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সুফল ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পর্দা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ পারিবারিক ও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করা হলে একদিকে যেমন নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অপরদিকে পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হবে।

১০. পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার প্রদান করা

পরিবারের প্রতিটি সদস্য একদিকে যেমন দায়িত্বশীল অপরদিকে তেমন অধিকারী। তাদের প্রত্যেকের অপরের নিকট অধিকার রয়েছে। পারিবারিক অপরাধের ক্ষেত্রে একে অপরের অধিকার যথাযথভাবে প্রদান না করা অন্যতম কারণ। তাই ইসলাম পরিবারের প্রত্যেককেই দায়িত্বশীল হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

[৪৬] আল-কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১

জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ ব্যক্তি (স্বামী) তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পরিবারের স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ওপরে দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সেবক তার মালিকের সম্পদের ব্যপারে দায়িত্বশীল; সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৪৭]

একজনের দায়িত্বই অপরজনের অধিকার। তাই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমন অধিকার রয়েছে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে প্রত্যেক সদস্যের অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করার বিকল্প নেই।

১১. পরিবারে সালাত প্রতিষ্ঠা করা

সালাত মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

আর আপনি সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।[৪৮]

যথাযথভাবে সালাত আদায় ব্যক্তিকে অনেক পাপাচার ও অপরাধ থেকে দূরে রাখে। যে পরিবারে সালাত প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে অন্যায় ও অপরাধ অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। সালাত মানুষকে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করে। তাই পারিবারিক জীবনে অপরাধ হ্রাস করতে হলে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, একা একা সালাত আদায়কে সালাত প্রতিষ্ঠা বলে না; বরং পরিবার ও সমাজের সকল সদস্য সালাত আদায় করাকে সালাত প্রতিষ্ঠা বলে।

১২. মাদক নির্মূল করা

পারিবারিক অপরাধের অন্যতম প্রধান করাণ হচ্ছে মাদক। আর এই মাদককে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছে। কোন মুসলিম সমাজে মাদক উৎপাদন, বাজারজাত, ক্রয়-বিক্রয়, পান ইত্যাদি সবকিছু করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

---

৪৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৮৯৩

৪৮. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ স. সকল প্রকার মদকে হারাম ঘোষণা করে বলেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই হারাম।[৫০]

ইসলাম মাদককে হারাম করলেও অনেক মুসলিমকে দেখা যায়, তারা মাদকাসক্ত হয়ে অনেক অপরাধ ঘটায়। তাই এসব অপরাধ সংঘটন বন্ধ করতে হলে মাদক সম্পর্কে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রীয় ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু মুসলিমরা ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে ফেলে। যার ফলে পারিবারিক সংকট আরো ঘনীভূত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিতব্য অপরাধ দমনে আত্মীয়গণ সালিশ কিংবা অন্য কোনভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে হারাম করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৫১]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ اللّٰهُ

আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[৫২]

---

৪৯. আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

৫০. ইমাম মুসলিম, আস-*সহীহ*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না কুল্লা মুসকিরিন খামর ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারাম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৩৩৬

৫১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ইছমুল কাতি', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৬৩৮

৫২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : সিলাতুর রিহীম ওয়া তাহরীমি তাকতীঈহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৬৮৩

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তির সাথে যেহেতু আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নেই, সেহেতু ঐ ব্যক্তি যে কোন অপরাধ করতে পারে। তাই পারিবারিক ক্ষেত্রে অপরাধ না করা ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তা সমাধান করার ক্ষেত্রে আত্মীয়দের ভূমিকা অনন্য।

১৪. ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন বৃদ্ধি এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করা

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে পরিবারে ও সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। এ জন্য কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস, রাসূলুল্লাহ স. এর জীবনী, সাহাবীগণ ও মুসলিম মনীষীগণের জীবনী ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সালাত, সিয়াম, দান-সাদাকা ইত্যাদি ইবাদতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়াও সন্তানের ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত করণ, অপসংস্কৃতি রোধ করণ, সুস্থ সংস্কৃতির অনুশীলন, পরিবারে সর্বদা ইসলামের অনুশাসন বাস্তবায়ন ইত্যাদির মাধ্যমেও পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের পথকে শুরুতেই বন্ধ করে আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

১৫. কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

ধর্মীয়, পারিবাররিক ও সামাজিক অনুশাসন ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের বিচার করে অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে কঠোর আইন প্রণয়ন, দায়েরকৃত মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণ, অপরাধীকে তার যোগ্য শাস্তি প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে এ প্রসঙ্গে একাধিক আইন থাকলেও সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অলসতা ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করে। তাছাড়া মামলার রায় পেতে দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে হবে। প্রয়োজনে এসব মামলার জন্য পৃথক ট্রাইবুনাল তৈরি করে বিচারকার্য ত্বরান্বিত করতে হবে।

উপসংহার

পরিবার হচ্ছে শান্তির আধার। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই শান্তিনিবাসে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। আজকাল পরিবারের এক সদস্য অপর সদস্যের হাতে নিরাপদ নয়। শারীরিক ও মানসিক ভাবে পারস্পরিক নির্যাতন হয় না এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উঠে এসেছে পারিবারিক জীবনে ঘটমান অপরাধসমূহের তালিকা, এর সাথে উঠে এসেছে পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের কারণ ও এ গুলো প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা। ইসলাম যেহেতু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পুর্বেই তা সংঘটনের পথ রুদ্ধ করতে চায়, সেহেতু বর্তমান প্রবন্ধে পারিবারিক জীবনে যে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ উদঘাটন করে

তা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার শাস্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও ইসলাম করেছে। ইসলামী দণ্ডবিধির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীকে অপরাধমুক্ত করার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। হুদূদ, কিসাস ও তাযীর এর মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার করা সম্ভব। প্রচলিত আইনের মাধ্যমেও এসব অপরাধের বিচার করা সম্ভব। তবে ইসলামী আইন অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর। যেহেতু Prevention is better then cure "রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম" সেহেতু বর্তমান প্রবন্ধে নির্দেশিত ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়ন করা গেলে পারিবারিক জীবনে অপরাধের হার শূণ্যের কোঠায় নেমে আসবে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতিই পারিবারিক জীবনে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই অপরাধের ক্রমবর্ধমান এই নবতর প্রবণতা রুদ্ধ করা না গেলে সার্বিক অর্থে পরিবার ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়বে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আরো বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা করে এর কারণসমূহ উদঘাটন করে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশে পারিবারিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা গেলেই পরিবারকে বাস্তবেই শান্তির আধারে পরিণত করা সম্ভব।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ:** *আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি মানবজাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তু ও আল্লাহর সৃষ্ট পরিবারের সদস্য। মানবজাতি প্রয়োজনে তাদের ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। কেননা জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, তাদের ব্যবহারও করতে হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী। ইসলামী আইনে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানবজাতির বিভিন্ন অধিকার প্রদানের পাশাপাশি জীবজন্তুর অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে জীবজন্তুর প্রতিও বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। আর জীবজন্তুর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর তা হলো তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশ্রাম নিশ্চিত করা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। আর আল্লাহর বিধান ব্যতীত তাদেরকে হত্যা না করা, তাদের কোন প্রকার জুলুম না করা। আর এ সকল বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করতে পারলে মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও জীবজন্তু থেকে কাঙ্খিত উপকার লাভ করতে পারবে।]*

ভূমিকা

মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তুও আল্লাহর পরিবারের সদস্য[১]। তাদেরও এ পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণের, অধিকার রয়েছে সুন্দরভাবে বসবাসের। আর আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে চতুষ্পদ জীবজন্তু থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন।[২] আর তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই মানবজাতিকে জীবজন্তুর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে। কেননা

---

* সিনিয়র প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা।

১. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم

২. চতুষ্পদ জন্তুর গোশত খাদ্য হিসাবে গ্রহণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ২২ : ৩৬; চতুষ্পদ জন্তুর দুধ পান প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ২৩ : ২১; জীবজন্তুর চামড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ১৬ : ৮০; জীবজন্তুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ১৬ : ০৭

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি[৩] হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব সকলের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা।

ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার

ইসলাম মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তুকেও বিভিন্ন অধিকার প্রদান করেছে। তাদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার দিয়েছে, খাদ্য গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং সকল প্রকার কষ্ট থেকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। নিম্নে তাদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান

মহান আল্লাহ আকাশ, যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানবজাতির অব্যবস্থাপনার জন্য তাঁর দেয়া জীবিকা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এ জন্যে আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তাই মানবজাতির অধীনে যে সকল জীবজন্তু রয়েছে, তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴾

যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা নিজেরা (তা) খাও এবং (তাতে) তোমাদের গবাদিপশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৪]

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির খাদ্য উৎপাদনের জন্য বাতাস প্রেরণ করেন ও আকাশ থেকে বৃষ্টি বষর্ণ করেন[৫] এবং তার মাধ্যমে শস্য, শাকসব্জি, ফল-মূল ও ঘন উদ্যান সৃষ্টি করেন।[৬]

---

৩. আল-কুরআন, ৬ : ১৬৫

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ...

৪. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪

৫. আল-কুরআন, ২৫ : ৪৫-৪৯

... وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

৬. আল-কুরআন, ৮০ : ২৪-৩২

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللّٰهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

সাহ্‌ল ইবনুল হানযালিয়্যা রা. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ স. একদিন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট-পিঠ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ স. বললেন, নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[৭]

ইসলামী আইনে জীবজন্তুদেরকে খাদ্য প্রদান করলে তার জন্য পুরস্কার[৮] আর খাদ্য প্রদান না করে কষ্ট দিলে শাস্তির ব্যবস্থার কথা[৯] বলা হয়েছে।

জীবজন্তুর খাদ্য উৎপাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক এম. শামসুল আলম লিখেছেন,

আমরা অধিক ফলনশীল গম, ধান, কুমড়া, টমেটো, গোলআলু ইত্যাদির বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করি এবং দেশে গবেষণা করে উন্নয়নের চেষ্টা করছি। অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি। খাদ্য সম্বন্ধেও গবেষণা হয়েছে। বিদেশে বহু ঘাস ও পশু খাদ্য গবেষণা করে বের করা হয়েছে যাতে কম খরচে অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। আমাদের দেশে পশুর প্রধান খাদ্য হলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দূর্বা জাতীয় ঘাস। দূর্বা ঘাসের উৎপাদন হয় কম ও ঘাসের বৃদ্ধি অত্যন্ত মন্থর। একমাসে দূর্বা ঘাস দুই ইঞ্চিও বাড়ে না। নেপিয়ার নামীয় একপ্রকার ঘাস বের হয়েছে যা প্রতিমাসে তিন ফুটের বেশী বৃদ্ধি পায়। ট্রেন, বাস ও এরোপ্লেনের যুগে ঘোড়া বা গাধায় চড়ে হজ্জ করতে রওয়ানা হওয়া যেমন অনভিপ্রেত, বর্তমানে

---

৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'যু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ২৫৫০

৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّيْهِ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَإِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ : فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সালাম, পরিচ্ছেদ : তাহরীম কাতালা আল হির্‌রাতু, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং ৫৯৮৯

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

নেপিয়ার ঘাস উৎপাদন চেষ্টা না করে দূর্বা ঘাসের উপর নির্ভর করে থাকা তেমনি বোকামি। অথচ এ বোকামি আমারা সমগ্র জাতি মিলে করছি। পশুখাদ্য এবং ঘাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা জাহিলিয়াত অতিক্রম করে আলোর জগতে আসতে পারি। এজন্যে আমাদের সনাতন পশুখাদ্য দূর্বাঘাস উৎপাদনের উপর নির্ভর না করে অধিক ফলনশীল ঘাস যেমন নেপিয়ার, প্যারাগিনি ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।[১০]

জীবজন্তু পবিত্র অবস্থায় ভক্ষণ করা

জীবজন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ। যদি তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হয় তাহলে অবশ্যই সুস্থ সবল অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে। কেননা খাদ্য যদি পূত-পবিত্র না হয়, তবে তা শরীরে জন্যও ক্ষতির কারণ হবে এবং তার দ্বারা মানবিক তৃপ্তিও আসবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

হে রসূলগণ,পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।[১১]

طيبت এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে طيبت অর্থ পবিত্র, হালাল, সুস্বাদু ও বৈধ। অর্থাৎ তোমরা হারাম ও অপবিত্র আহার্য ভক্ষণ করো না।[১২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

অতএব, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে থাক।[১৩]

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১৪]

---

১০. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪, পৃ. ৪৬১-৪৬২

১১. আল-কুরআন, ২৩ : ৫১

১২. কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, খ. ৮, পৃ. ১৩২

১৩. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৪

১৪. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

জীবজন্তু যবেহ-এর সময় অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে[১৫] এবং ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে, যাতে জন্তুটির কষ্ট কম হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হতে পারে।[১৬] আর শিকারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর মাধ্যমে শিকার করতে হবে।[১৭]

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর জীবন ধারণের জন্য মানুষের খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক, তাই ইসলামে খাদ্যবস্তু গ্রহণ সম্পর্কে নীতিমালা রয়েছে। শাক-সবজি ও ফলমূল, মাছ অথবা সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে ইসলামে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। হালাল-হারামের বিধান মূলত প্রদান করা হয়েছে জীব-জন্তুর গোশ্ত সম্পর্কে। হালাল জীবজন্তু ও পাখির গোশত আহার করা প্রসঙ্গে ইসলাম বিস্তারিত নীতিমালা দিয়েছে। এখানে 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা 'স্বাস্থ্যকর' ও 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন' বোঝা হয়েছে। পঁচা বা দূষিত খাদ্য পবিত্র নয়। এতে বোঝানো যায় যে, 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ চান যেন আমরা কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য আহার করি, যা আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্য সহায়ক হবে।[১৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

> নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[১৯]

মহান আল্লাহ তাআলা যে ভাবে পবিত্র বস্তু গ্রহণ করতে বলেছেন, ঠিক সেভাবে অপবিত্র বস্তু পরিহার করতে বলেছেন।[২০] কেননা অপবিত্র বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে

---

১৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩৪
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

১৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সায়্যিদু আয যাবাহি, পরিচ্ছেদ : আল আমরি বিইহসানি আয যাবহি আল কাতলি ওয়া তাহদিদি আশ শাফরাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৫১৬৭
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

১৭. আল-কুরআন, ৫ : ৪
وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

১৮. গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৭৯

১৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

২০. আল-কুরআন, ৫ : ৩

শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গ রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত পশুর ন্যায় (ভক্ষণ করা হারাম)।[২১]

ভ্রমণের সময় জীবজন্তুর প্রতি খেয়াল রাখা

মানবজাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদন সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ভ্রমণ করতে হয়। আর বাহন ব্যতীত ভ্রমণ চিন্তা করা যায় না। আর আল্লাহ্ তাআলা জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতির বাহনের প্রয়োজন পূরণ করেছেন।[২২] ভ্রমণে অনেক সময় সাথে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় না থাকার কারণে কষ্ট হয়ে থাকে। মানবতার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ স. এ সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা বাগানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন উটকে তার হক দান কর। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মরুপ্রান্তরে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে।[২৩]

রাসূলুল্লাহ স. আরো ইরশাদ করেন:

إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে চলাচল কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার পাওনা আদায় করতে দিও। আর যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত ভূমি দিয়ে পথ চল তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করবে এবং যখন কোথাও রাত যাপনের জন্যে অবতরণ করবে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

২১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ছায়দি, পরিচ্ছেদ : ফি কারাহাতি ছায়দি কুতিআ মিনহু কিতআতুন, প্রাগুক্ত, খ. ৩ , পৃ. ৭০, হাদীস নং ২৮৬০

২২. আল-কুরআন, ১৬ : ০৭ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

আল-কুরআন, ৩৬ : ৭২ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

২৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি সুরআতি আস সায়রি আন নাহি আত তাআরিসি ফি আত তারিক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ২৫৭১

তখন পথে মঞ্জিল করবে না। কেননা, তা হচ্ছে জন্তুদের রাতে চলার পথ এবং ছোট ছোট অনিষ্টকর প্রাণীদের রাতের আশ্রয়স্থল।[২৪]

সফরে মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হবে। আর যদি সাথে কোন জীবজন্তু থাকে তবে তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ

আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না।[২৫]

জীবজন্তুর প্রাপ্য আদায়ের পর তাদের ব্যবহার করা

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব পৃথিবীতে সকল সৃষ্ট জীবের প্রাপ্য পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা। আর ঠিক তেমনি ভাবে জীবজন্তুকেও তাদের প্রাপ্য প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।[২৬]

প্রাচীনকাল থেকে জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতি তাদের যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণ করে আসছে। তাদের হক আদায় করার মাধ্যমে প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করা যাবে। যানবাহন ব্যবহারের যেমন বিধি রয়েছে (ফিটনেস, ট্যাক্সটোকেন, রোডপার্মিট, চালকের লাইসেন্স, জ্বালানি সরবরাহ, অতিরিক্ত মালামাল বহন না করা), তদ্রূপ জীবজন্তুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করে[২৭] ও

---

২৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল ইমারাহ, পরিচ্ছেদ : আন মুরাআতি মাছলাহাতিল আদ দাওয়াব্বি ফি আস সায়রি ওয়া আন নাহি আনি আততারিশি ফি আততারিকি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ৫০৬৮

২৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আত তাহরিশু বায়না আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ২৫৫৩

২৬. আল-কুরআন, ১৬ : ১০

২৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল ইমারাহ, পরিচ্ছেদ : আন মুরাআতি মাছলাহাতিল আদ দাওয়াব্বি ফি আস সায়রি ওয়া আন নাহি আনি আততারিশি ফি আততারিকি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ৫০৬৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

অতিরিক্ত মালামাল না চাপিয়ে অনুকূল পরিবেশ তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[২৮]

আর জীবজন্তুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হলে উত্তম পন্থায় যবেহ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ইহসান ফরজ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া উচিত এবং যবেহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত। [২৯]

জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ

জীবজন্তু আল্লাহ তাআলা মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানবজাতি তাদের থেকে কল্যাণ গ্রহণের পাশাপাশি কষ্টও দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জীবকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে অন্য কাজে বাধ্য করে কষ্ট দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ . فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ. تَعَجُّبًا وَفَزَعًا. أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

আবূ হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি গাভীকে হাকাচ্ছিল। গাভীটি লোকটির দিকে চেয়ে বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল চাষের জন্য। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হয়ে উঠল এবং তারা বলল সুবহানাল্লাহ ! গাভী কথা বলে? রাসূলুল্লাহ স. বললেন: এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আবু বকর, উমরও বিশ্বাস করে।[৩০]

---

[২৮]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

[২৯]. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, তাহকীক : ড. আব্দুল গাফফার সুলাইমান বান্দারী, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : হুসনি আয যাবহি, প্রাগুক্ত, খ. ৩ ,পৃ. ৬৪, হাদীস ৪৫০১

[৩০]. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : ফাদাইলু আস সাহাবাতি, পরিচ্ছেদ : ফাদাইলু মিন আবি বাকার সিদ্দিক , প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১০, হাদীস নং ৬৩৩৪

জীবজন্তুর মাঝে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য যে সকল কল্যাণ রেখেছেন তার মাঝে দুধ অন্যতম।[৩১] কিন্তু মানবজাতি অতি মুনাফার লোভে জীবজন্তুর স্তনে দুধ জমা করে রেখে তাদের কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ স. এভাবে দুধ জমা করে রাখতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাফিলার সাথে আগেই গিয়ে দেখা করা যাবে না। তোমাদের কেউ যেন অপরের দাম বলার সময় দাম না বলে। খরিদের উদ্দেশ্য ছাড়া দরদাম করে মালের মূল্য বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীতে গিয়ে লোকের থেকে ক্রয় না করে। আর উট ও বকরীর স্তনে দুধ জমা করে না রাখে। এ অবস্থায় কেউ তা ক্রয় করলে সে দুধ দোহনের পরে দুটি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভালো মনে করবে, তা-ই ইখতিয়ার করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে তা রেখে দেবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দেবে এক সা খেজুরসহ।[৩২]

জীবজন্তু নির্বোধ, কিন্তু মানবজাতির বোধ থাকা সত্ত্বেও নির্বোধের মত আচরণ করে থাকে। তাদেরকে প্রহার করে কষ্ট দেয়।[৩৩] অনেকেই আবার বিনা কারণে জীবজন্তুর উপর মালামাল বোঝাই করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে।[৩৪] রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

---

৩১. আল-কুরআন, ২৩ : ২ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

৩২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল বুয়ূ , পরিচ্ছেদ : তাহরিমু বায়য়ু আর রাজুলি আলা বায়য়ি আখিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫, হাদীস নং ৩৮৯০

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল লিবাস আয যিনাতু, পরিচ্ছেদ : আন নাহী আন দারবাবিল হায়ওয়ানি ফি ওয়াজহিহি ওয়া ওয়াসমিহি ফিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৩, হাদীস নং ৫৬৭২

ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আয যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : ইযা যাবাহতুম ফা আহসিনু আয যাবহি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৫৮, হাদীস নং ৩১৭১

سعيد الخدري قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل وهو يجر شاة بأذنها فقال (دع أذنها وخذ بسالفتها

৩৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি আল ওকুফি আদ আদাব্বাতি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ২৫৬৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ

ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি নুযুলি আল মানাযিল, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ২৫৫ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ

সমাজে দেখা যায় যে, অনেক জীবজন্তু একই সময়ে যবেহের প্রয়োজন হলে তাদের বেধে ফেলে রাখা হয় এবং তাদের একের সম্মুখে অন্যটিকে যবেহ করা হয়। আবার অনেক সময় যবেহ-এর পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে জীবজন্তুকে বেধে ফেলে রাখা হয়, তার পর চাকুতে ধার দেওয়া হয় ও যবেহকারী মনোনয়ন করা হয়। এভাবে জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم: وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যবাই করার সময় যেন দ্রুত যবাই করে।[৩৫]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ .

শাদ্দাদ ইবন আওস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. থেকে আমি দু'টি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কতল করবে, দয়ার্দ্রতার সাথে কতল করবে, আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সাথে যবেহ করবে। তোমাদের সকলেই যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে কষ্ট না দেয়।[৩৬]

জীবজন্তুর অঙ্গচ্ছেদ করা নিষেধ

জীবজন্তু আল্লাহর অন্যতম একটি সৃষ্টি। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির বিভিন্ন কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। তাদের থেকে উপকৃত হতে হলে তাঁর বিধান অনুযায়ী উপকার লাভ করতে হবে। কিন্তু মানবজাতি অনেক সময় নিজেদের খেয়াল খুশি পূরণের জন্য এমন কাজ করে, যা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হয়। তারা জীবজন্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাদেরকে কষ্ট দেয়। ইসলাম জীবজন্তুর প্রতি এরূপ আচরণ হারাম করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

---

৩৫. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আয যাবাইহ , পরিচ্ছেদ : ইযা যাবাহতুম ফাআহসানুয যাবহি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৫৯, হাদীস নং ৩১৭২

৩৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আস সায়্যিদু আয যাবাহি, পরিচ্ছেদ : আল আমরি বিইহসানি আয যাবহি আল কাতলি ওয়া তাহদিদি আশ শাফরাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৫১৬৭

(শয়তান বলে) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[৩৭]

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শয়তানকে যে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, (জীবজন্তুর অঙ্গচ্ছেদ করে) সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার আনুগত্য ও আল্লাহর আনুগত্য কখনই সম্মিলিত হতে পারে না। শিরক মিশ্রিত ইবাদত কস্মিনকালেও আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবার নয়। فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا অর্থাৎ শিরক এর কারণে তারা তাদের আসল সম্পদ ঈমান হারিয়ে ফেলবে এবং জান্নাতের বদলে প্রবিষ্ট হবে জাহান্নামে।[৩৮]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمثل بالبهائم

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. পশুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।[৩৯]

এ প্রসঙ্গ তিনি আরো বলেন,

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - وَهَذَا لَفْظُهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لاَ تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاَ أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ

উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘাড়ের পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের কাপড় স্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক।[৪০]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النهبة والمثلة

---

৩৭. আল-কুরআন, ৪ : ১১৯

৩৮. কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, খ. ৩, পৃ. ১৮১

৩৯. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আয যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : আন নাহী সাবরিল আল বাহাইমু ওয়া আনি আল মিছলাতি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬৩, হাদীস নং ৩১৮৫

৪০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি কারাহাতি জায্যা নাওয়াছি আল খায়লি আয নাবিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং ২৫৪৪

আদী ইবনে ছাবিত রা. কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নবী করীম স. লুটতরাজ ও পশুর অঙ্গহানি ঘটাতে নিষেধ করেছেন।[৪১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত পশুর ন্যায় (ভক্ষণ করা হারাম)।[৪২]

জীবজন্তুর পরস্পরের মাঝে লড়াই লাগানো নিষেধ

আল্লাহ তাআলা গৃহপালিত জীবজন্তুকে মানবজাতির অধীন করে সৃষ্টি করে তাদের কল্যাণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানবজাতি তাদের কল্যাণ গ্রহণের পাশাপাশি অকল্যাণের দিকেও ঠেলে দেয়। তারা নিজেদের মনোবাসনা পূরণের জন্য জীবজন্তুর মাঝে লড়াই লাগিয়ে কষ্ট দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এ কারণে তাদের মৃত্যুও হয়ে থাকে। ইসলাম এহেন কর্ম হারাম করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ (তা ব্যতিক্রম), যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এ সব গোনাহের কাজ।[৪৩]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ বলেন, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দয়াশীল এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুকম্পাসম্পন্ন হয়ে উঠুক– শরীয়তের এটাই লক্ষ্য। মানুষ যেন জন্তুগুলোকে অসহায় করে ছেড়ে না

---

৪১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : যাবায়িহা ওয়াছছাইদি ওয়াততাসয়িাহ, পরিচ্ছেদ : মা য়াকরাহু মিনা আল মিছলাতি ওয়া আল মাছবুরাতি ওয়া আলমজাছ্ছামাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১০০, হাদীস নং ৫১৯৭

৪২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ছায়দি ,পরিচ্ছেদ : ফি কারাহাতি ছায়দি কুতিআ মিনহু কিতআতুন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭০, হাদীস নং ২৮৬০

৪৩. আল-কুরআন, ৫ : ৩

দেয়। এ রকম যে, কোনটি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল, আর কোনটি উঁচুস্থান থেকে পড়ে গিয়ে মরল, আর কোনটি অন্য জন্তুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শিং- এর গুঁতা খেয়ে মরে গেল, জন্তুর মালিক সে ব্যাপারে নিজের কোন দায়িত্বই অনুভব করল না, তা আল্লাহর আদৌ পছন্দ নয়। জন্তুগুলোকে কেউ এমন নির্মমভাবে মারধর করে, যার ফলে সেটির মরে যাওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাড়ায়। জন্তুর লড়াই লাগিয়ে অনেকে আনন্দ পায় বা জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। তাতে একটি জন্তু অপর জন্তুটিকে গুঁতিয়ে আহত ও রক্তরঞ্জিত করে দেয় ফলে আহত জন্তুটি নির্বাক যন্ত্রণায় কষ্টপায়। এই কাজও আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।[৪৪] এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. পশুদের লড়াই লাগাতে বারণ করেছেন।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

عن مجاهد عن بن عمر : أنه كره أن يحرش بين البهائم

মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর রা. চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।[৪৬]

জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা চালানো নিষেধ

জীবজন্তু মানবজাতির ন্যায় আল্লাহরই সৃষ্টি। মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলা এ অধিকার দেননি যে, তারা তাঁর সৃষ্টির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিবে। কেননা মানবজাতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রতিষেধক ও প্রসাধনী তৈরির জন্য জীবজন্তুর উপর বিভিন্ন প্রকার গবেষণা চালিয়ে থাকে। ফলে তারা নানাভাবে আহত ও কষ্টের শিকার হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও হয়। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ ও একান্ত প্রয়োজন ব্যাতীত জীবজন্তুর ওপর এরূপ পরীক্ষা চালাতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

---

৪৪. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, (অনুবাদ : মাওলানা আবদুর রহীম রহ.,) ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪তম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৭০-৭১

৪৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আত তাহরীশু বায়না আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩১, হাদীস নং ২৫৬৪

৪৬. ইমাম বুখারী, *আল আদাব আল মুফরাদ*, অধ্যায় : আদাবু আল আম্মাতি, পরিচ্ছেদ : আত-তাহরীশু বায়না আল বাহাইম, বৈরুত : দার আল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪২২, হাদীস নং ১২৩২

যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল: আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। (শয়তান বলে) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[৪৭]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال : من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز و جل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তার হক কী? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।[৪৮]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

عن ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর রা. কিছু সংখ্যক কোরাইশ যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। আর প্রত্যেক লক্ষ্য ভ্রষ্টতার কারণে তারা পাখির মালিকের জন্য একটি করে তীর নির্ধারণ করছিল। অতঃপর তারা ইবন উমর রা. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইবন উমর রা. বললেন, কে এ কাজ করল? যে এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। রাসূলুল্লাহ স. তাকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানায়।[৪৯]

খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত জীবজন্তু হত্যা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য তাঁরই সৃষ্টিকুলের আরেক শ্রেণীকে উৎসর্গ করেছেন। তাই মানবজাতি তাদের খাদ্যের প্রয়োজনে জীবজন্তুকে যবেহ করে

---

৪৭. আল-কুরআন, ৪ : ১১৯

৪৮. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : মান ক্বাতালা আসফুরান বিগায়রি হাক্কিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৪৪৫৯

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সাইদি আযযবাইহ, পরিচ্ছেদ : আন নাহী আন সাবরিল বাহিমু, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৩, হাদীস নং ৫১৭৪

ভক্ষণ করতে পারে।[৫০] কিন্তু খাদ্য ও নিরাপত্তা ব্যতীত ইসলামে জীবজন্তু হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।[৫১]

مَن قَتَلَ نَفْسًا এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন,

قطع الطريق ، وقطع الأشجار ، وقتل الدواب إلا لضرورة ، وحرق الزرع وما يجري مجراه

রাস্তা কাঁটা, বৃক্ষ নিধন করা, বিনা প্রয়োজনে চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা ও ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।[৫২]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز و جل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها

যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তার হক কী? তিনি বললেন তার হক হলো তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা। [৫৩]

তিনি আরও বলেন:

أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ .

---

৫০. আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
আল-কুরআন, ২২ : ৩৬
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৫১. আল-কুরআন, ৫ : ৩২

৫২. আবূ- হাইয়্যান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন্দালুসী, *তাফসীরে বাহরুল মুহীত*, তাহকীক : আদেল আহমাদ আব্দুল মাউজুদ, বৈরুত : দারুর কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০১, খ, ৩, পৃ. ৪৮৩

৫৩. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : মান ক্বাতালা আসফুরান বিগায়রি হাক্বিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস ৪৪৫৯

একটি পিঁপড়া নবীকুলের কোন নবীকে কামড় দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, একটি মাত্র পিঁপড়া তোমাকে কামড় দিল, তাতে কিনা তুমি সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টিদলকে জ্বালিয়ে দিলে, যারা তাসবীহ পাঠ করছিল।"[৫৪]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِىَّ - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِىَ عَنْهُنَّ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِى الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلاَدَ النِّسَاءِ.

নাফি রহ. সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আবূ লুবাবা ইবন আব্দুল মুনযির আল-আনসারী রা.-এর বাসস্থান ছিল কুবায়। এরপর তিনি মদীনায় (মসজিদে নববীর নিকট) স্থানান্তরিত হলেন। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাঁর (আবূ লুবাবা রা.-এর) সাথে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর জন্য একটি ছোট দরজা খুলছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁরা বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী প্রকৃতির একটি সাপ দেখতে পেলেন। তারা সেটি মেরে ফেলতে উদ্যত হলে আবূ লুবাবা রা. বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) ওগুলো হত্যা করতে বারণ করেছেন। তিনি (ঐ সাপগুলোকে) বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী সাপ বুঝাতে চেয়েছেন। আর লেজ খসা ও পৃষ্ঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেছেন। বলা হয়েছে যে, সে দুটি সাপ হল এমন, যারা দৃষ্টিশক্তি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।[৫৫]

জীবজন্তু লালনপালন করা

আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন। আর তাদের কর্তব্য, জীবজন্তুর সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এ থেকে কল্যাণ আহরন করা। রাসূলুল্লাহ স. তাদের লালন-পালনের জন্য এবং খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিণ করেছিলেন। যাকে হিমা[৫৬] বলা হত। যেখানে পরিবেশ ও জীবজন্তু সংরক্ষণ করা হত এবং জীবজন্তু অবাধে বিচরণ করতে পারত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾

---

৫৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সালাম, পরিচ্ছেদ : আন নাহী আন কাতলুল নামলি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৯৮৬

৫৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সালাম, পরিচ্ছেদ : কালিল হাইয়্যাতি ওয়া গায়রিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯, হাদীস নং ৫৯৬৯

৫৬. রক্ষা, প্রতিরক্ষা, আশ্রয়, আশ্রয়স্থল; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৩০০

অতঃপর আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন, তিনি তা থেকে প্রস্রবণ বের করেন ও চারণভূমি সৃষ্টি করেন এবং পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন। এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের পশুসমূহের ভোগের জন্য।[৫৭]

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى﴾

তিনি সে মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীকে বিছানারূপে তৈরি করেছেন। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যোগাযোগ ও চলাচলের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর তিনিই আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন। তারপর তাই দিয়ে নানা সবুজ শ্যামল শস্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তা খাও এবং তোমাদের পশুগুলোকে তাতে চরাও। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে জ্ঞানীদের জন্য।[৫৮]

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।[৫৯]

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ

আবূ ওহাব আল-জুশামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: তোমরা ঘোড়া প্রতিপালন কর। আর এর কপালের পশম ও ঘাড়ের পশম যত্নসহ মুছে দিও এবং এর গলার নিদর্শনের মালা পরাইও। কিন্তু ধনুক তারের কবজ পরাইও না।[৬০]

ইসলামে কুকুর পোষা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু গৃহপালিত জন্তু রক্ষার জন্য তা জায়িয করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية

---

৫৭. আল-কুরআন, ৭৯ : ৩০-৩৩
৫৮. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪
৫৯. আল-কুরআন, ১৬ : ১০
৬০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ইকরামিল খায়লি ইরবাতিহা ওয়াল মাসহি আলা আকফালিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৯, হাদীস নং ২৫৫৫

যে ব্যক্তি কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কীরাত সওয়াব হ্রাস করা হয়, তবে শিকারী কুকুর অথবা গৃহপালিত জন্তু রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ছাড়া।[৬১]

জীবজন্তুর চিকিৎসা করা

জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতি বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে[৬২] এবং তাদের সুস্থ-সবল রাখার দায়িত্ব মানবজাতির। তাই ইসলাম জীবজন্তুর চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوا اللَّهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[৬৩]

পশু কুরবানীর মাধ্যমে মানবজাতি বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। তাই কুরবানীর পশু সুস্থ ও সবল রাখতে হবে। তাই তাদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد

আবূ সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. শিং বিশিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট একটি মেষ কুরবানী করেন, যার মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের ছিল।[৬৪]

উল্লেখ্য যে, কুরবানীর জন্যে যে পশুর প্রয়োজন তা লেংড়া, খোঁড়া, শিংভাঙা বা অসুস্থ হলে চলবে না। কুরবানীর পশু হতে হবে সুস্থ, সবল এবং নিখুঁত। সুস্থ নীরোগ ও নিখুঁত হতে হলে প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পশুর অসুস্থ হওয়া তো আরও স্বাভাবিক। যারা কুরবানী দিতে চায় বা কুরবানীর জন্যে পশু বিক্রি করে, তাদের এটা জানা প্রয়োজন, পশুকে কিভাবে সুস্থ এবং সবল করতে হয়, অসুস্থ হলে কি রোগে কি চিকিৎসা করতে হয়।[৬৫] রাসূলুল্লাহ স. অসুস্থ পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।[৬৬]

---

৬১. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সায়দ ওয়া আয়-যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : আল রুখছাতু যফ ইমসাকি আলকালবি লিলমা শিয়াতি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৯, হাদীস ৪৭৯৫

৬২. আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯-৮০

الله الذى جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنهاتاكلون ولكم فيها منا فع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم

৬৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

৬৪. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদাহী, পরিচ্ছেদঃ মা য়াসতাহিব্বু মিনাল আদাহী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৬, হাদীস নং ৩১২৮

৬৫. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

তাই মানবজাতীর প্রয়োজনেই জীবজন্তুকে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে রোগমুক্ত করে সুস্থ-সবল রাখতে হবে।

জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা

মানবজাতির ন্যায় সকল জীবজন্তু আল্লাহর পরিবারের সদস্য। তারা একে অপরের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। মানবজাতি জীবজন্তু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, খাদ্যের ব্যবস্থা, পরিধান ও পরিবহণের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। তাই তাদেরই প্রয়োজন পূরণের জন্য জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

﴿ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَـٰهَ إِلا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফ্স থেকে, তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে তোমাদের জন্য দিয়েছেন আট জোড়া; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে: এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে; তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব; রাজত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারপরও তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে।[৬৭]

এ প্রসঙ্গ আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদজন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।[৬৮]

---

৬৬. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : মা য়ানহা আনহু মিনাল আদাহীল আওরা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস ৪৪৫৯

عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأضاحي قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال وما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد

৬৭. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬

৬৮. আল-কুরআন, ৪২ : ১১

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিভিন্ন সময়ে যদি কুরবানী করতে হয় তবে পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কুরবানী যেমন পূণ্য, কুরবানীর কথা স্মরণ রেখে কুরবানীর জন্যে যবেহ উপলক্ষে পশুপালন করাও তেমনি পূণ্য। এতে যারা পশু বিক্রি করে তারাও পুণ্য অর্জন করবে। কারণ পশুপালন করা না হলে কুরবানীর জন্যে পশু পাওয়া যাবে না।[৬৯] এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن أم هانيء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة

উম্মে হানী রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী স. তাকে বলেছেন, তুমি বকরী পালন কর। কারণ তাতে বরকত রয়েছে।[৭০]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى رجلا من الأنصار . فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إياك والحلوب

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল স. এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে আল্লাহর রাসূল স.-এর জন্য পশু যবাই করতে ছুরি নিল। আল্লাহর রাসূল স. তাকে বললেনঃ সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবাই করবে না। [৭১]

জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করা

মহান আল্লাহ জীবজন্তু থেকে উপকার গ্রহণের পাশাপাশি মানবজাতিকে তাদের নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা মানবজাতি জীবজন্তু থেকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থা থেকে উপকার লাভ করে থাকে। তাই তাদের দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, তাদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ও নতুন নতুন প্রজাতির আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

তোমাদের জন্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় আছে পশু-সম্পদে। তোমাদের আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তা থেকেই তোমরা গোশত আহার কর।[৭২]

---

৬৯. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

৭০. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তিজারাত, পরিচ্ছেদঃ ইত্তিখাযুল মাশিআতি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭৩, হাদীস নং ২৩০৪

৭১. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয যাবাইহ, পরিচ্ছেদঃ আন নাহী আন যাবহি যাওয়াতিদ দারি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬১, হাদীস নং ৩১৮০

৭২. আল-কুরআন, ২৩ : ২১

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে عبرة অর্থ শিক্ষণীয় নিদর্শন, দলিল-প্রমাণ, যা আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে শিক্ষণীয় কিছু নেই। তাই আল্লাহ তাআলা এখানে إِنَّ বা অবশ্যই অব্যয় ব্যবহার করেছেন। শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের প্রতি। অতঃপর لَكُمْ 'তোমাদের জন্যে'। অর্থাৎ সকল মানুষের চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[৭৩] তিনি আরো ইরশাদ করেন:

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ﴾

অবশ্যই গবাদি পশুর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।[৭৪]

আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের গবাদিপশু আছে। এগুলোর মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা এগুলোর মান উন্নত করা যায়।[৭৫] উল্লেখ্য যে, দুগ্ধ যে শুধু সুস্বাদু তা নয়, বিশুদ্ধও। কিভাবে পশুর দেহে দুগ্ধ সৃষ্টি হয়, এ সম্পর্কে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে গবেষণা করা অবশ্যই মানুষের কর্তব্য। আল-কুরআনে বহু বিষয়ের সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে মানুষ তাদের কল্যাণের জন্যে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে।[৭৬]

উপসংহার

আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাঝে যে সকল উপকার রেখেছেন তা গ্রহণ করতে হলে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। তাদের কোন প্রকার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট না দিয়ে উপকার গ্রহণ করতে হবে। যার মাধ্যমে মানবজাতি নিজেদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাদের থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। এই আলোচনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে শুধু মানুষের অধিকারই নিশ্চিত করা হয়নি বরং সকল জীবজন্তুর অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে।

---

৭৩. কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ উসমানী, *তাফসীরে মাজহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২৪

৭৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬

৭৫. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজিঃ নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000 এবং MS-Word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন-এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যেভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب-كتاب) : ..., পরিচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।
যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।
যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম (ইটালিক), তারিখ ও সাল, পৃ... ।
যেমন : *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www : ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।

(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।

(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।

(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।

(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।

(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ ....

....

বয়স .... পেশা..

ফোন/মোবাইল ঃ ....সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

➪ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-
➪ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-
➪ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: APRIL-JUNE : 2015 :: Tk. 100/-